বাংলাদেশের ইমামবারা: স্থাপত্যিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য

গবেষক

মো: নাসিরুল ইসলাম

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

জুলাই, ২০১০

RB
B
Z26.2
ISB

Dhaka University Institutional Repository

449261

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ইমামবারা: স্থাপত্যিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য

গবেষক

মো: নাসিরুল ইসলাম

449261

Dhaka University Library
449261

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

জুলাই, ২০১০

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের ইমামবারা: স্থাপত্যিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য

(এম. ফিল ডিগ্রীর জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দাখিলকৃত অভিসন্দর্ভ)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. নাজমা বেগম

অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

449261

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

উপস্থাপক

মো: নাসিরুল ইসলাম

এম.ফিল গবেষক

নিবন্ধন নম্বর: ১৮৩/২০০৩-২০০৪

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুলাই, ২০১০

ঘোষনা পত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, 'বাংলাদেশের ইমামবারাঃ স্থাপত্যিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য' অভিসন্দর্ভটি সম্পূর্ন ভাবে আমার নিজস্ব রচনা। এ অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য লিখিত হয়েছে এবং এটি বা এর অংশ বিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন ডিগ্রী বা ডিপ্লোমার জন্য উপস্থাপিত হয়নি।

449361

মো. নাসিরুল ইসলাম 29.09.10

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

উপস্থাপক

মোঃ নাসিরুল ইসলাম

এম. ফিল গবেষক

নিবন্ধন নম্বর : ১৮৩/২০০৩-০৪

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়ন পত্র

এতদ্বারা প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, এম.ফিল গবেষক মো: নাসিরুল ইসলাম, নিবন্ধন নম্বর: ১৮৩/২০০৩-০৪, কর্তৃক উপস্থাপিত 'বাংলাদেশের ইমামবারা: স্থাপত্যিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এম.ফিল. ডিগ্রীর আবশ্যকীয় দিকগুলোর আংশিক পরিপূর্ণতা বিধানের লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে এবং নিম্ন স্বাক্ষরকারী এ গবেষণা প্রকল্পটি পূর্বাপর তদারক করেছেন। প্রার্থীকে এম.ফিল. ডিগ্রী প্রদান করার অনুকূলে এটিকে বিবেচনা করার জন্য সুপারিশ করা হল।

Najma Begum 27.7.10

তত্ত্বাবধায়ক

ড. নাজমা বেগম

অধ্যাপক,

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'বাংলাদেশের ইমামাবারা: স্থাপত্যিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য' শিরোনামে যে গবেষনা পত্রটি আমি প্রণয়ন করেছি আমার একার পক্ষে একাজ সম্পন্ন করা কোন ক্রমেই সম্ভব পর নয়। যে সকল মহৎ ব্যক্তিত্বের অনুপ্রেরণা ও সহযোগীতায় আমি এ পর্যায়ে উপনীত হতে পেরেছি তন্মধ্যে আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড. নাজমা বেগমকে প্রথমেই আমার শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। গবেষণা কর্মে শিরোনাম নির্ধারণ উপাত্ত সংগ্রহের নির্দেশনা ও সহযোগিতা, অধ্যায় পরিকল্পনা এবং অভিসন্দর্ভের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তথ্য-উপাত্ত ও বাস্তব পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক একটি পূর্ণ গবেষণা কর্ম তৈরীর ক্ষেত্রে তাঁর অকৃতিম সহযোগীতা ও উপদেশ প্রদানের ফলেই আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হলো। আমার অভিসন্দর্ভটির প্রতিটি অধ্যায় তিনি অতি যত্নে ও গুরুত্বের সাথে বারবার দেখে দিয়েছেন। তাঁর অপরিসীম স্নেহ, উৎসাহ-অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষনিক সহযোগিতা আমার কাজকে সহজ করেছে।

গবেষণা কর্মটি প্রণয়নে আরো যাঁদের উপদেশ ও সহযোগিতা পেয়েছি তাঁরা হলেন, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর ড. আয়শা বেগম, প্রফেসর ড. হাবীবা খাতুন, প্রফেসর ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, জনাব মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস, জনাব মো ছিদ্দিকুর রহমান খান ও জনাব এসএম মফিজুর রহমান সহ আমার বিভাগীয় শিক্ষক মণ্ডলী ।

গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহকালিন প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য আমি বিশেষভাবে উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ড. জিনাত আরা সিরাজী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থগার, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, ঢাকা কেন্দ্রিয় পাবলিক লাইব্রেরী, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ লাইব্রেরী, হোসেনী দালান লাইব্রেরী, ঢাকাস্থ ইরানীয়ান কালচারাল সেন্টার লাইব্রেরীতে কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগীয় লাইব্রেরী বিশেষ করে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ লাইব্রেরী, ইতিহাস বিভাগ লাইব্রেরী

ব্যবহার করেছি। প্রতিষ্ঠান সমূহের সংশ্লিষ্ট সকলেই আমাকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ এবং ঋনী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে এম.ফিল গবেষণার সুযোগ প্রদান করায় আমি এ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকলের কাছে কৃতজ্ঞ। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার ফলেই আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করা সম্ভব হলো।

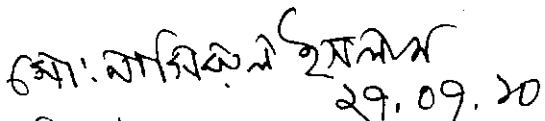

মো: নাসিরুল ইসলাম

এম. ফিল গবেষক,

নিবন্ধন নম্বর : ১৮৩/২০০৩-০৪

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যৌক্তিকতা

কোন গবেষণা কর্ম পাঠক সমাজে উপস্থাপন করতে গেলে তার কারণ পাঠক সমাজকে জানানো প্রয়োজন। আমার এ গবেষণা কর্মটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, নিবন্ধন নম্বরঃ ১৮৩/২০০৩-০৪ সনের এম.ফিল গবেষণার অভিসন্দর্ভ হিসেবে প্রণীত।

আমার গবেষণা কর্মটি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের জন্য ও বাংলাদেশে শিয়া সম্প্রদায়ের ইমামবারার ইতিহাস পাঠক সমাজের নিকট উপস্থাপন করার প্রয়াসে রচিত। এ অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম 'বাংলাদেশের ইমামাবারাঃ স্থাপত্যিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য'।

ইতিহাসের যুগান্তকারী কারবালা ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিয়া সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠিত ইমামবারা ও তার ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে এখন পর্যন্ত তেমন কোন উল্লেখযোগ্য আলোচনা ও গবেষণা হয়নি সে কারণে তা হওয়া প্রয়োজন। কারবালার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য বিষয়ে কিছু গবেষণা বা ইতিহাস, গ্রন্থ ও মর্সিয়া সাহিত্য রচিত হয়েছে। ইমামবারা নির্মাণ ও তার পেছনের স্থাপত্যিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য আমাকে ইমামবারা সম্পর্কে গবেষণায় উৎসুক। আমি এতে মূল উৎস হিসাবে আকর গ্রন্থকে প্রাধান্য দিয়েছি এবং এর পাশাপাশি মাঠপর্যায়ে বাস্তব পর্যবেক্ষণ করেছি। অনেক সীমাবদ্ধতার ভিতর দিয়েও আমি কাজটি নিষ্ঠার সাথে করার চেষ্টা করেছি।

গবেষণার সীমাবদ্ধতা

'বাংলাদেশের ইমামাবারা: স্থাপত্যিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য' অভিসন্দর্ভটি সম্পন্ন করতে গিয়ে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা পরিলক্ষিত হয়েছে। তন্মধ্যে উৎস এবং গবেষণা পদ্ধতিগত কিছু সীমাবদ্ধতা উল্লেখ যোগ্য।

প্রথমতঃ এ অভিসন্দর্ভ প্রণয়নের জন্য মুসলমানদের বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের আকীদা, বিশ্বাস একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ করে শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ের মানুষ মহররমের ঘটনাটিকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে মুল্যায়ণ করে। ধর্মীয় দৃষ্টিতে যা খুবই স্পর্শকাতর। তাই এ ব্যাপারে বেশ সর্তকতা অবলম্বন করতে হয়েছে। ফলে নিরপেক্ষ বিচার বিশ্লেষণ ও মতামতের অভাব দারুণ ভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে, যে কারণে ইমামাবারার নিরপেক্ষ ও প্রকৃত ইতিহাস উদ্ধার করতে বেশী শ্রম দিতে হয়েছে। আন্যদিকে বাংলাদেশে শিয়াদের সংখ্যা তুলনামূলক কম হওয়ায় গবেষণা কর্মে তাদের ব্যাপারে উৎসাহ খুব একটা দেখা যায় না । তা সত্ত্বেও এ নিয়ে আলোচনা সমালোচনা থেকেই যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ ৬১ হিজরীর মহররম মাসের দশ তারিখে কারবালার মরু প্রন্তরে যে যুদ্ধ সংঘঠিত হয়েছিল তাতে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স:) এর দৈহিত্র ও হযরত আলীর (র:) এর পুত্র ইমাম হোসেন সহ তাঁর সহযাত্রীরা আনেকেই শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু গবেষণার শিরোনাম 'বাংলাদেশের ইমামাবারা : স্থাপত্যিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য' অনুযায়ী কারবালার ইতিহাস স্মরণীয় করতে বাংলাদেশের শিয়া সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মীয় স্থাপত্য ইমামবারা। এই ইমামবারাকে ঘিরে যেসব ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় রয়েছে তা আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি মূলতঃ একটি তথ্য উদঘাটনকারী এবং সত্যে উপনীত হবার প্রক্রিয়া। কারবালার হৃদয়-বিদারক ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী ও মোড় পরিবর্তনকারী ঘটনা হিসাবে এ ব্যাপারে অনেক সাহিত্য, ইতিহাস, শোকগাথা

ইত্যাদি রচনা করা হয়েছে। এ ঘটনা বর্ণনা করে আরবী, উর্দু, বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণীত হয়েছে। কারবালার ঘটনাটি সরাসরি মুসলিম সমাজের হৃদয়-বিদারক হওয়ার কারণে বিভিন্ন মুসলিম দেশে বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলমানদের দৃষ্টি ভঙ্গির এতে প্রতিফলন ঘটেছে।

সর্বোপরি সংগৃহীত উপাত্ত এবং তার সমর্থিত তথ্যাবলী দিয়ে ইতিহাস গবেষণার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল ডিগ্রীর জন্য আমার এই অভিসন্দর্ভ প্রণয়ন করা হল।

আলোকচিত্রের তালিকা

১. বিবিকা রওজা ইমামবারা (১৬০০), ঢাকা

১.১ বিবিকা রওজা ইমামবারার প্রধান প্রবেশ পথ

১.২ বিবিকা রওজা ইমামবারায় মোমবাতি জ্বালাচ্ছেন কয়েকজন নারী

২. হোসেনী দালান ইমামবারা, (১৬৪২) ঢাকা

২.১ হোসেনী দালান ইমামবারার সম্মূখ চিত্র

২.২ হোসেনী দালান ইমামবারার প্রধান প্রবেশ পথ

২.৩ হোসেনী দালান ইমামবারার বর্গাকৃতির স্তম্ভে আরবী ক্যালিওগ্রাফী ও ফুলের নকশা

২ .৪ পুকুরসহ হোসেনী দালান ইমামবারা

২.৫ হোসেনী দালান ইমামবারার অভ্যন্তরের চিত্র

২.৬ হোসেনী দালান ইমামবারার অভ্যন্তরে বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলান

২.৭ ইমামবারার অভ্যন্তরে ইমাম হাসান (রা:) ও ইমাম হোসেন (রা:) এর প্রতীকী মাজার

২.৮ মহররম মাসে আশুরার দিন জীবন্ত প্রতীকী দুল দুল ঘোড়ার পা দুধ দিয়ে ধোয়ে দিচ্ছেন একজন

২.৯ মহররমে আশুরার দিন দুল দুল ঘোড়ার পা ধোয়া দুধ সংগ্রহে ব্যস্ত কয়েকজন

২.১০ মহররমের দিন দুল দুল ঘোড়ার পা ধোয়া দুধ শিশুদের শরীরে মাখিয়ে দেওয়া দৃশ্য

২.১১ মহররমের দিন দুল দুল ঘোড়ার পা ধোয়া দুধ নিজের শরীরে দিচ্ছেন একজন নারী

২.১২ ঢাকার আজিমপুরে মহররমের মিছিলে অংশগ্রহণকারী জনতা

২.১৩ ঢাকার আজিমপুরে মহররমের মিছিলে প্রতীকী মাজার বহনকারী জনতা

২.১৪ ঢাকার আজিমপুরে মহররমের মিছিলে শোকের পতাকাবাহী জনতা

২.১৫ ঢাকার আজিমপুরে মহররমের মিছিলে শোকের পতাকা সহকারে জনতা

২.১৬ ঢাকার আজিমপুরে মহররমের মিছিলে মাতমরত অংশগ্রহণকারী মহিলাগণ

২.১৭ ঢাকার আজিমপুরে মহররমের মিছিলে অংশগ্রহণকারী কিছু লোক ছোরা দিয়ে নিজের শরীর ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত করছেন

৩. মোহাম্মদপুর ইমামবারা (শিয়া মসজিদ), ঢাকা

৩.১ মোহাম্মদপুর ইমামবারা প্রবেশ পথ

৩.২ মোহাম্মদপুর ইমামবারায় সংরক্ষিত আলম ও বিশেষ পতাকা

৩.৩ মোহাম্মদপুর ইমামবারায় মহররমের মিছিলে ব্যবহৃত আলম ও পতাকাযুক্ত মিম্বর

৪. মগবাজার ইমামবারা, ঢাকা

৪.১ মগবাজার ইমামবারা

৪.২ মগবাজার ইমামবারা অভ্যন্তরের মিম্বর

৪.৩ মগবাজার ইমামবারার অভ্যন্তরের সংরক্ষিত জারীখানা

৫. মিরপুর ইমামবারার অভ্যন্তরে সংরক্ষিত তাজিয়া

৬. পল্টন ইমামবারা, ঢাকা

৬.১ পল্টন ইমামবারা

৭. ভূমি নকশা, মাধৈল ইমামবারা, নওগাঁ (তথ্যসূত্র: এবিএম হোসেন, স্থাপত্য খণ্ড-২)

৮. ঠাকুরগাঁও ইমামবারা

৮.১ গাছে আচ্ছাদিত ঠাকুরগাঁও ইমামবারা

৯. গড়পাড়া ইমামবারা, মানিকগঞ্জ

৯.১ গড়পাড়া ইমামবারার উন্মুক্ত প্রাঙ্গন

৯.২ গড়পাড়া ইমামবারার মহররমের মিছিলে ব্যবহৃত তাজিয়া

৯.৩ গড়পাড়া ইমামবারার ডঙ্কা (ঢোল)

১০. পৃত্রিম পাশা ইমামবারা, মৌলভী বাজার

১০.১ পৃত্রিম পাশা ইমামবারার পেছনের চিত্র

১০.২ পৃত্রিম পাশা ইমামবারার সিঁড়িযুক্ত প্রবেশ পথ

১০.৩ পৃত্রিম পাশা ইমামবারায় কাঠের তৈরী তাজিয়া

১১. মুড়ালী ইমামবারা, যশোর

১২ সুলতানশী ইমামবারা, হবিগঞ্জ

১৩. চন্দ্রচুড়ী ইমামবারা, হবিগঞ্জ

১৩.১ চন্দ্রচুড়ী ইমামবারার পাক-পাঞ্জাতন

১৩.২ চন্দ্রচুড়ী ইমামবারার মহররমের মিছিলে ব্যবহৃত বাঁশ ও কাগজ দিয়ে তৈরী প্রতীকী দুলদুল ঘোড়া

১৩.৩ চন্দ্রচুড়ী ইমামবারার ভিতরের মাজার

১৪. সদরাবাদ ইমামবারা, হবিগঞ্জ

১৪.১ সদরাবাদ ইমামবারার অলংকরণ

১৫. কুর্শী ইমামবারার ফ্যাসাদ, হবিগঞ্জ

১৫.১ কুর্শী ইমামবারার পার্শ্ব চিত্র

১৬. মুড়ারবন্দ ইমামবারা, হবিগঞ্জ

১৬.১ মুড়ারবন্দ ইমামবারার পাক-পাঞ্জাতন

১৭. সুরাবই ইমামবারা, হবিগঞ্জ

১৭.১ সুরাবই ইমামবারার পাক-পাঞ্জাতন

১৮. চট্টগ্রাম ইমামবারা

১৮.১ চট্টগ্রাম ইমামবারার মেহরাব ও মিম্বর যুক্ত ভিতরের চিত্র

গবেষণায় ব্যবহৃত আলোকচিত্রগুলো মাঠ পর্যায়ে গিয়ে গবেষকের নিজের তোলা। শুধুমাত্র মাধৈল ইমামবারার ভূমি নকশাটি বই থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের ইমামবারা: স্থাপত্যিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য

সূচীপত্র

বিষয় বস্তু	পৃষ্ঠা নং
ঘোষণা পত্র	এক
প্রত্যয়ন পত্র	দুই
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	তিন
যৌক্তিকতা	পাঁচ
গবেষণার সীমাবদ্ধতা	ছয়
আলোকচিত্রের তালিকা ও ভূমি নকশা	আট

প্রথম অধ্যায়

১. উপক্রমনিকা	১
১.ক. শিয়াদের পরিচিতি	২

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. শিয়া ইমাম	৫
২.ক. ইমামবারা	৫
২.খ. মহররম ও কারবালা	৭

তৃতীয় অধ্যায়

৩. ভারত উপমহাদেশে শিয়াদের আগমন	৯
৩.ক. বাংলাদেশে শিয়াদের আগমন ও ইমামবারা স্থাপনের পটভূমি	১০

চতুর্থ অধ্যায়

রাজধানী ঢাকায় নির্মিত বিদ্যমান ইমামবারার স্থাপত্যিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য

৪.ক. বিবিকা রওজা ইমামবারা ১৪

৪.খ. হোসেনী দালান ইমামবারা ১৬

৪.গ. মোহাম্মদপুর ইমামবারা ২৩

৪.ঘ. মগবাজার ইমামবারা ২৪

৪.ঙ. মিরপুর ইমামবারা ২৫

৪.চ. পল্টন ইমামবারা ২৬

ঢাকার বাইরে নির্মিত বিদ্যমান ইমামবারার স্থাপত্যিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য

৫.ক. মাধৈল ইমামবারা, নওগাঁ ২৭

৫.খ. ঠাকুরগাঁও ইমামবারা ২৭

৫.গ. গড়পাড়া ইমামবারা, মানিকগঞ্জ ৩০

৫.ঘ. পৃত্রিম পাশা ইমামবারা ৩৪

৫.ঙ. মুড়ালী ইমামবারা, যশোর ৩৫

৫.চ. অষ্টগ্রাম ইমামবারা ৩৬

৫.ছ. সুলতানশী ইমামবারা ৩৯

৫.জ. চন্দ্রচুড়ী ইমামবারা ৪১

৫.ঝ. সদরাবাদ ইমামবারা ৪২

৫.ঞ. কুর্শী ইমামবারা ৪৩

৫.ত. মুড়ারবন্দ ইমামবারা ৪৪

৫.থ. সুরাবই ইমামবারা ৪৫

৫.দ. চট্টগ্রাম ইমামবারা ৪৬

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার ৪৯

পরিশিষ্ট

ক. রাজধানী ঢাকার কতিপয় পারিবারিক ইমামবারা ৪৩

খ. বাংলাদেশে বিলুপ্ত প্রায় ইমামবারা ৫৬

গ. শব্দকোষ ৫৭

ঘ. আলোকচিত্র ৬০

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র ৯০

বাংলাদেশের ইমামবারা : স্থাপত্যিক ইতিহাস ও ঐতিহ্য

প্রথম অধ্যায়

১. উপক্রমনিকা :

আরবি 'শিয়া' শব্দের অর্থ অনুসারী, দল, সম্প্রদায়, সাথী, কারো পশ্চাতে গমনকারী[১]। শিয়া বলতে ওই ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি হযরত আলী (রা:) ও আহলে বাইতের সমর্থক, ইমামত-আকিদা এবং হযরত আবু বকর (রা:), হযরত ওমর (রা:), হযরত ওসমান (রা:) অপেক্ষা আলীর (রা:) অধিক গুরুত্বে বিশ্বাসী[২]। শিয়াদের বক্তব্য অনুযায়ী শিয়া সম্প্রদায় হলো মুসলিম বিশ্বের একটি সম্প্রদায়। এ সম্প্রদায়ের অনুসারীরা তাওহিদের পতাকাবাহক। আদম সন্তানদের মধ্যে সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্ব এ সম্প্রদায়ের মূল শ্লোগান। ইয়ামেনের জনৈক ইহুদি শিক্ষাবিদ আবদুল্লাহ ইবনে সাবা ওরফে ইবনে সাওদা হযরত ওসমানের (রা:) খেলাফতকালে ইসলাম গ্রহণ করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মধ্যে আন্ত:বিরোধ ও গোলযোগ সৃষ্টি করে ধ্বংস করা। মদিনা, বসরা ও সিরিয়ায় সুবিধা না করতে পেরে মিসরে গিয়ে দুরভিসন্ধিতে কয়েকজন সহযোগী পেলেন। প্রথমে একটা বক্তব্য দিল-আমার আশ্চর্য লাগে হযরত ইসা (আ:) পৃথিবীতে পুনঃআগমন করবেন অথচ শ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ (সা:) আগমন করবেন না, এটা হতে পারে না। পরে আবারো বলল- প্রত্যেক নবীর একজন অছি বা ভারপ্রাপ্ত থাকেন। হজরত মুহাম্মদের (সা:) অছি হযরত আলী (রা:) তিনি বললেন- তাওরাতে তাঁকেই ভারপ্রাপ্ত বলা হয়েছে। অতএব, রাসুলের (সা:) পর খলিফা হওয়ার প্রকৃত অধিকার হযরত আলী (রা:)।

---

[১] ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৩শ খন্ড, ইকাবা, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ-৭৪৪।

[২] মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েতুদ্দীন, ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্তমতবাদ, ঢাকা-২০০৪, পৃ-২২৫

১.ক. শিয়াদের পরিচিতি :

হযরত ওসমানকে (রা:) অযোগ্য প্রমাণিত করার এক পর্যায়ে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার একদল অনুসারী বিদ্রোহী হয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত তারা হযরত ওসমানকে (রা:) হত্যা করল এবং পরিস্থিতির বিবেচনায় হযরত আলী (রা:) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। এ সময় মুসলিম উম্মাহ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ল এবং সিফফিনের মতো পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ পর্যন্ত সংঘটিত হলো। সিফফিনের যুদ্ধে আবদুল্লাহ ইবনে সাবার বিপুলসংখ্যক ভক্ত হযরত আলীর (রা:) পক্ষে ছিলেন। তাদের বলা হয় 'শিয়ায়ে আলী' বা আলীর দল। এভাবেই রাজনৈতিক দল হিসাবে প্রথম শিয়াগণ আবির্ভূত হন। আবদুল্লাহ ইবনে সাবাই শিয়াদের প্রতিষ্ঠাতা।

ইসলামের ইতিহাসে খিলাফত ও ইমামত প্রশ্নে যে ক'টি রাজনৈতিক কলহের সূচনা হয়েছিল তার মধ্যে 'শিয়া' মতবাদ সবচেয়ে বিস্তৃত ও ক্রিয়াশীল। উক্ত মতাবলম্বীরা ইসলামের প্রাথমিক যুগে মহানবী (সা:) মৃত্যুর অব্যবহিত পরই মুসলিম বিশ্বে যে নেতৃত্ব শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রেক্ষাপটে নিজেদের গোড়া চিন্তা-দর্শনকে সামনে নিয়ে সমগ্র মুসলিম চেতনায় দ্বিধাবিভক্তির সৃষ্টি করেন। তারা প্রথম তিন খলিফার প্রতি প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে এবং খলিফা আলীর খেলাফতে তাঁর সমর্থন দেন। খারেজিদের হাতে চতুর্থ খলিফার হত্যাকাণ্ডে শিয়া মতবাদ তাদের প্রথম সুস্পষ্ট ভিন্নতা প্রকাশ করে। পরবর্তীকালে উমাইয়া আমলে ৬৮০ খ্রিস্টাব্দে কারবালার বিয়োগান্ত ঘটনায় শিয়া মতবাদ ব্যাপকভাবে বিস্ফোরিত হয়। তারা ৯০৯ খ্রিস্টাব্দে উত্তর আফ্রিকায় ফাতেমী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে। এভাবে শিয়া মতবাদ বিভিন্ন উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে আধুনিককালে টিকে রয়েছে।

শিয়ারা দু'ভাগে বিভক্ত : (i) একদল মনে করেন, হযরত আলী সব সাহাবা থেকে মর্যাদাবান। (ii) অপর দল মনে করেন, আলী (রা:) মর্যাদাবান, কোরআন পরিবর্তন হয়েছে। এ বিশ্বাসীদের উপদলগুলো হচ্ছে: ক) সাবাঈয়াহ খ) গুরাবিয়াহ গ) কিসানিয়াহ ঘ) যায়দিয়াহ ঙ) ইমামিয়া ইছনা আশারিয়া চ) ইমামিয়া ইসমাঈলিয়া[৩]।

আব্বাসী শাসনামলে শিয়ারা ক্ষমতা দখল করেন। আব্বাসী শাসকদের রাজধানী ইরাক পূর্ব থেকেই শিয়াদের অন্যতম কেন্দ্র ছিল। শায়খ আবু জাফর তুসি ৪৪৮ হিজরিতে বাগদাদ ত্যাগ করে নাজাফ গেলে পরে শিয়া শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র হয় নাজাফ। বর্তমানকালেও নাজাফ বিশ্ব শিয়া সম্প্রদায়ের সর্বাপেক্ষা বড় শিক্ষা কেন্দ্র। বর্তমান ইরাকের প্রায় ৪৫ ভাগ মানুষ শিয়া মতাবলম্বী। ইরানের কুম্ম নগরীও শিয়াদের অন্যতম কেন্দ্র। শাহ ইসমাঈল সাফাবি শিয়া মতবাদের আরো প্রসার ঘটান। সাফাবি শাসন-পরবর্তী সময়ে যানদিয়া ও কাচারিয়া সুলতানরা শিয়াদের সহযোগিতা করেন। বর্তমানে ইরানে শিয়াদের কুম্ম, মাশহাদ, তেহরান, নিশাপুর, নিহাওয়ানদসহ বিভিন্ন শহরের শিয়াদের বড় বড় কেন্দ্র ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিদ্যমান রয়েছে।

বর্তমান সৌদি আরবের মদিনার সন্নিকটে নাগাবিলা, কাতিফ ও ইহসাতে শিয়া বসতি রয়েছে। দামেস্ক, লেবানন, বৈরুতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিয়া রয়েছে। জাবাল আমিলের শহর সায়দা ও সূরে শিয়াদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। ইয়ামেনে যায়দিয়া সম্প্রদায় ও শাফেয়ি মতাবলম্বী ছাড়াও শিয়ারা বসবাস করে। বাহরাইনে অধিকাংশ লোক শিয়াপন্থী। কাতার-কুয়েতে শিয়া, মাসকাটে খারেজি ও সিন্ধু প্রবাসী খোজা শিয়ারা বর্তমানেও আছেন। আফগানিস্তানে সাফাবি আমলে শিয়াদের আগমন ঘটে। বর্তমান হিরাত, কাবুল, গজনী, কান্দাহার, কিযিলবাশ হাজারা ও বারবাং গোত্রের লোকেরা সবাই শিয়া। পূর্ব আফ্রিকার যানজিবাং, উগান্ডা, কেনিয়া, তাঞ্জানিয়া, বাংগো, মাদাগাস্কারে উল্লেখযোগ্য হারে শিয়া রয়েছেন। রাশিয়ার ইরওয়ানের সব অধিবাসী

[৩] আমিনুল ইসলাম, মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি, ঢাকা-২০০৬, পৃ-৮৪

শিয়া। বাদকুবাতে অধিকাংশ এবং বুখারায় বেশ কিছু শিয়া মতাবলম্বীরা রয়েছেন। তুর্কিস্তানের শারাবিয়ান, মামগান, তাবরীয়, আজারবাইজান ও শিরওয়ানে শিয়াদের বসবাস লক্ষণীয়। মায়ানমার, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া বিপুলসংখ্যক শিয়া রয়েছে। পাকিস্তান, ভারত ও এই বাংলা অঞ্চলে আলিম ও মুবাল্লিগের মাধ্যমে শিয়া মতের প্রচার লাভ করে[৪]। ৬১৭ হিজরিতে চেঙ্গিস খান ইরান আক্রমণ করলে ইতোপূর্বে উমাইয়া অত্যাচারে আশ্রিত আলীভক্তরা ভারতবর্ষে চলে আসেন।

[৪] ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৩শ খন্ড, ইকাবা, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ-৭৫২

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. শিয়া ইমাম :

ইমাম শব্দটি পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন অর্থে মোট এগারবার ব্যবহৃত হয়েছে[৫]। এ শব্দের অর্থ 'নেতা', 'আদর্শ'। শব্দটি চিহ্ন বা নিদর্শন অর্থেও ব্যবহৃত হয়। বাস্তব জীবনে তিনটি ক্ষেত্রে ইমাম শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়: (১) ইমাম জামা'আতে অনুষ্ঠিত সালাতের নেতা। পাঞ্জেগানা সালাতের ইমামকে পেশ ইমাম এবং জুম'আর সালাতের ইমামকে খতিব বলা হয়। সালাতের আহকাম সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান ও প্রয়োজনীয় যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন মুসলিম ইমাম হতে পারেন। (২) সুন্নীগণ নামাজের নেতা অর্থে খলীফাদের প্রতি এবং সম্মান প্রদর্শনার্থে বিখ্যাত আলিমদের প্রতি ইমাম শব্দটি প্রয়োগ করে থাকেন। (৩) শিয়াগণ ইমাম শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। তবে এ সম্পর্কে তাদের ধারণার মর্মকথা এই যে কেবলমাত্র হযরত আলী (রা:) ইব্ন আবী তালিবের বংশধরগণই হবেন ইসলাম জগতে সর্বোচ্চ শাসনকর্তা[৬]। সিকান্দার শাহ-এর সময় (১৩৫৮-১৩৮৭) হতে বাংলার কোন কোন সুলতান খলীফা এবং ইমাম উপাধি গ্রহন করেছিলেন[৭]।

২.ক. ইমামবারা :

ইমামবারা প্রধানত উপমহাদেশের একটি প্রতিষ্ঠান। 'ইমামবারা' শব্দ দিয়ে উপমহাদেশে মহররমের অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য শিয়াদের নির্মিত ভবন বা সম্মেলন কক্ষকে বোঝানো হয়[৮]। আক্ষরিক অর্থে ইমামবারা ইমামের বাড়িকে বুঝায়। কিন্তু স্থাপত্যিক অর্থে ইমামবারা শিয়া মিলনায়তন যেখানে মহানবীর দৌহিত্র হযরত ইমাম হোসাইনের মৃত্যু দিবস আশুরার অনুষ্ঠান পালিত হয়[৯]। মহররম মাসে এবং শিয়াদের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ইমামবারাতে মজলিস হয়। ইমামবারা প্রধানত

---

[৫] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলাপিডিয়া খণ্ড-১, ঢাকা: ২০০৩, পৃ. ৪১৫
[৬] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলাপিডিয়া খণ্ড-১, ঢাকা: ২০০৩, পৃ. ৪১৫
[৭] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলাপিডিয়া খণ্ড-১, ঢাকা: ২০০৩, পৃ. ৪১৫
[৮] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ও অন্যান্য, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ সমিক্ষামালা-১, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ,৩২৭-৩২৮
[৯] এবিএম হোসেন, স্থাপত্য, খণ্ড-২, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,২০০৭, পৃ, ৪১৭-৪২০

ভারতীয় একটি প্রতিষ্ঠান যার আবির্ভাব হয়েছিল আঠারো শতকে। সফদার জঙ (১৭০৮-৫৪) খ্রিঃ মহররম মাসের দশ তারিখে আশুরা পালনের জন্য দিল্লিতে একটি ভবন নির্মাণ করেন। কিন্তু এ ভবনকে ইমামবারা বলা হতো না। সফদার জঙের পৌত্র আসাফুদ্দৌলা অনুরূপ একটি ভবন লক্ষ্ণৌতে নির্মাণ করেন। এটি 'ইমামবারা-ই-আসাফী' নামে পরিচিতি লাভ করে। দক্ষিণ ভারতে ইমামবারা 'আশুরাখানা' ও উত্তর ভারতে ইহা 'ইমামবারা' নামেই পরিচিত[১০]।

ইমাম হলেন ধর্মীয় নেতা অথবা মুসলিমদের নামায পরিচালনার প্রধান[১১]। ইমামবারা শিয়াসম্প্রদায়ের ইমাম হোসেনের (রা:) স্মরণে নির্মিত ভবন। ইমামবারা ঠিক মসজিদ নয়, তবে এখানে নামাজ আদায়, মিলাদ মাহফিলের ব্যবস্থা থাকে। ইমামবারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর প্রধান কক্ষে জাঁকজমকের সঙ্গে তাজিয়া স্থাপন করা হয়। তাজিয়া হলো কবরের অনুকৃতি। ইমামবারায় প্রধানতঃ ইমাম হাসান (রা:) ও ইমাম হোসেন (রা:)-এর দু'টি প্রধান তাজিয়া থাকে। ক্ষেত্রবিশেষে আরো অধিক তাজিয়াও রাখা হয়। তাজিয়ার ওপর শামিয়ানা টানিয়ে দামি গিলাফ দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। ইমাম হোসেন (রা:)-এর তাজিয়া সবুজ ও ইমাম হাসান (রা:) এর তাজিয়ায় লাল গিলাফ ব্যবহার করা হয়। তাজিয়া মিছিলেও তাদের স্মরণে এই দুই রঙের নিশান ওড়ানো হয়। এ ছাড়া ইমামবারায় কারবালা ময়দানের মানচিত্র ও বোর্ড বা ক্যানভাসে আঁকা যুদ্ধক্ষেত্রের কাল্পনিক দৃশ্য, ঢাল-তলোয়ার, জিঞ্জিরসহ নানা সরঞ্জাম সাজিয়ে রাখা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশে ইমামবারা শিয়াদের দ্বারা মহররমের অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য নির্মিত ভবন বা সম্মেলন কক্ষকে বোঝানো হয়[১২]। মুসলিম পঞ্জিকার প্রথম মাস মহররম মাসে এবং শিয়াদের নিকট গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে ইমামবারাতে মজলিস (সভা/সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হতো। হযরত ইমাম হোসেন (রা:) এর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে কারবালার কাহিনী বর্ণনা, মর্সিয়া

[১০] ইসলামী বিশ্বকোষ, খণ্ড-২৩, ইফাবা, পৃ.৭৫১
[১১] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলাপিডিয়া খণ্ড-১, ঢাকা: ২০০৩, পৃ. ৪১৫
[১২] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলাপিডিয়া খণ্ড-১, ঢাকা: ২০০৩, পৃ. ৪১৫

(শোকগাঁথা) আবৃত্তি, শোকমিছিল ও মাতম (শোকের চিহ্ন হিসেবে বুক চাপড়ানো) করা হতো।

পশ্চিম বাংলায় বেশ কয়েকটি ইমামবারা রয়েছে। এগুলির মধ্যে মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারি প্রাসাদের ইমামবারা এবং হাজী মুহম্মদ মোহসীন ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হুগলির ইমামবারা উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশেও বেশ সংখ্যক ইমামবারা আছে। এগুলির অবস্থান ঢাকা, মানিকগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, অষ্টগ্রাম, ঠাকুরগাঁও এবং সিলেট। একসময় শুধু ঢাকাতেই ১৫টি ইমামবারা ছিল[১৩]। এর মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ইমামবারা হলো সৈয়দ মীর মুরাদ কর্তৃক ১৬৪২ খ্রিঃ নির্মিত হোসেনী দালান ইমামবারা।

২.খ. মহররম ও কারবালা :

আরবী মাসের প্রথম মাসটির নাম হলো 'মহররম' মাস। এ মাস মুসলমানদের কাছে বহুভাবে প্রসিদ্ধ। এ মাসেই কারবালার মরু প্রান্তরে যে নৃশংস হৃদয় বিদারক ঘটনা ঘটেছে তা অনন্তকাল পর্যন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে বেদনা বিধুর শোকের ছায়া নিয়ে বিরাজ করবে। মানব ইতিহাসের সূচনা লগ্ন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত অসংখ্য ও অগণিত হৃদয় বিদারক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু ৬১ হিজরীর মহররম মাসে ফোরাতের তীরে কারবালার মরু প্রান্তরে হযরত ইমাম হোসেন (রাঃ) সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর ৭১ জন সঙ্গীসহ শাহাদাৎ বরণ করে যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তাঁর নমুনা আর একটি দেখানো সম্ভব নয়। ৬১ হিজরির ১০ মহররম ইমাম হোসেন (রাঃ) ইরাকের ফোরাত নদীর তীরের কারবালা প্রান্তরে ইয়াজিদ বাহিনীর ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে সপরিবারে শহীদ হন।[১৪] পাশেই প্রবাহিত ফোরাত নদী অথচ তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একফোঁটা পানিও তাঁরা পাননি। প্রাণ উৎসর্গ করে তাঁরা সত্য ও

[১৩] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলাপিডিয়া খণ্ড-১, ঢাকা: ২০০৩, পৃ. ৪১৫
[১৪] ইসলামী বিশ্বকোষ, খণ্ড-২৩, ইফাবা, পৃ.৭৪৪-৭৫২

ন্যায়ের আদর্শ চিরভাস্বর করে রেখে গেছেন। সেই হৃদয় বিদারক বেদনাকে স্মরণ করে ১০ মহররম মুসলিম বিশ্ব কারবালার শহীদের স্মরনে ও রুহের মাগফিরাত কামনায় ইবাদত-বন্দেগি করেন। তবে শিয়াসম্প্রদায় এ ঘটনা স্মরণ করে তাদের নিজস্ব রীতিতে। মহররম মাসের প্রথম দিন থেকে আশুরা পর্যন্ত ১০ দিন ধরে ইবাদত-বন্দেগির পাশাপাশি তারা মর্সিয়া, মাতম, তাজিয়া মিছিলসহ বিভিন্ন ধর্মীয় ভাবগম্ভীর্যের মধ্যে তাঁরা কারবালার শহীদদের স্মরণ করে থাকেন।

তৃতীয় অধ্যায়

৩. ভারত উপমহাদেশে শিয়াদের আগমন :

আঠার শতকে অযোধ্যার শাসক ছিলেন শিয়া মতাবলম্বলী। তার আমলে বহু মসজিদ ও ইবাদতখানা নির্মিত হয়। সেসময় শিয়াদের ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রেস এবং বহু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানও গড়ে ওঠে। শিয়া আলেমদের মধ্যে সায়্যিদ দিলদাল আলী গুফরান মা'আব ও তার ছাত্ররা সামাজিক প্রথার সংস্কার এবং ধর্ম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। শিয়া ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় রামপুর, বেগুনবালী, জাবিরা, মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি শিয়া শাসকরা, বাংলার নবাবগণ, তালপুরের মীররা ও লাহোরের কিযিলবাশরাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ভারত বিভক্তির পূর্বে শিয়া অধ্যুষিত জৌনপুর, হায়দারাবাদ, লাক্ষ্ণৌ ইত্যাদি অঞ্চলে শিয়াদের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। ভারত বিভক্তির পর অন্য মুসলমানদের সঙ্গে শিয়ারাও পাকিস্তানের করাচি, হায়দারাবাদ, খায়রপুর, মুলতান, লাহোর, সারগোধায় উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন।

এই উপমহাদেশে ঠিক কখন মুহররমের তাজিয়া শোভাযাত্রা উৎসব শুরু হয় তা জানা যায় না[১৫]। বাগদাদের বুয়াইদ সুলতানগণ ইমাম হোসেনের শাহাদাত স্মরণে দশই মুহররম জাতীয় শোক দিবস ও সাধারণ ছুটির দিন হিসেবে উদযাপনের প্রথা প্রবর্তন করেন। এটা প্রতীয়মান হয় যে, মোঘল সাম্রাজ্যে প্রার্থনা ও শোক দিবসরূপে মহররম উৎসব শুরু হয় এবং কালক্রমে তাজিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপকরণগুলো যুক্ত হয়ে পড়ে। ফাদার মনসেরাত সম্রাট আকবরের আমলের মুহররম উৎসব উদযাপনের বর্ণনা রেখে গেছেন[১৬]। তিনি লিখেছেন যে, মহররমের সময় মুসলমানগণ এ আদর্শ জীবনে এবং সত্যের জন্য তাদের ত্যাগের দুঃখ কষ্ট সহ্য করার করুণ কাহিনী বর্ণনা করত।

---

[১৫] বাংলার সামাজিক ও সংস্কৃতিক ইতিহাস, দ্বিতীয় পত্র, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ-২০০

[১৬] এম,এ, রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-১৯৯

এতে সমবেত শ্রোতাদের মধ্যে শোকোচ্ছ্বাস এবং অশ্রুপ্রবাহ বয়ে চলত। শেষের দিন (১০ই মহররম) তারা সমাধি-চিতা তৈরী করত এবং এগুলোকে একটির পর একটি করে পুড়িয়ে ফেলত। লোকেরা জলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তো অতঃপর তারা তাদের পা দিয়ে নিভে যাওয়া ছাইগুলো ছড়িয়ে ফেলত। তারা ইমাম হাসান হোসেনের নাম করে উচ্চস্বরে চিৎকার করে উঠত। মানডেলসলো আগ্রায় সম্রাট শাহজাহানের আমলের মহররম শোভাযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন তিনি বলেন, 'তীর-ধনুক' পাগড়ি, ভোজালি এবং পশমি পোশাক-পরিচ্ছদে আবৃত শবাধারগুলোর শোভাযাত্রা শহরের রাস্তায় রাস্তায় বহন করে নেয় এবং অশ্রুসিক্ত চোখে বিলাপ করতে করতে লোকেরা তা অনুসরণ করে[১৭]। তাদের কেউ কেউ এই অনুষ্ঠানে নৃত্য করে। অন্যান্যরা একে অন্যের সঙ্গে তাদের তরবারির আঘাত করে; শুধু তাই নয়, তাদের অনেকে নিজেদের দেহে এমনভাবে আঘাত করে ক্ষত সৃষ্টি করে যা থেকে রক্ত বেরিয়ে আসে। সেই রক্ত দিয়ে তারা তাদের কাপড় রঞ্জিত করে। এভাবে শোভাযাত্রা অদ্ভুত আকার ধারণ করে। রাত্রের দিকে তারা মহান শহীদদের (হাসান, হোসেন) হত্যাকারীদের চিহ্নিত করার জন্যে খড়কুটা দিয়ে কয়েকটি মানুষের প্রতিকৃতি তৈরী করে এবং এগুলোর প্রতি অসংখ্য তীর নিক্ষেপ করে পরে তারা সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে ভস্মে পরিণত করে।

৩.ক. বাংলাদেশে শিয়াদের আগমন ও ইমামবারা স্থাপনের পটভূমি :

ষোড়শ শতকে মোঘলদের বাংলা জয়ের সময় থেকে, এই প্রদেশে শিয়া প্রভাব অনুভূত হয়। শাহজাহানের রাজত্বকালে বিশেষত শাহজাদা শুজার সুবাদারি আমলে বাংলায় বহু সংখ্যক শিয়া সম্প্রদায়ের লোক বসতি স্থাপন করে। মুর্শিদাবাদের নবাবদের আমলে শিয়া জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়; এবং নবাবগণ শিয়া বংশোদ্ভূত হওয়ায় রাজধানী শহর এবং জাহাঙ্গীরনগর ও হুগলী ইত্যাদি স্থানগুলো তাদের সংস্কৃতির

[১৭] এম,এ, রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-১৯৯

গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়[১৮]। ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যে শিয়াদের ইমামবারাগুলোর উল্লেখ আছে। কবি মুকুন্দরাম বলেন, শিকারি রাজা (কালকেতু) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নতুন শহর গুজরাটে মুসলমানগণ তাদের বসতির পশ্চিম প্রান্তে তাদের হাসানহাটি (ইমামবারা অর্থাৎ মহররমের জন্য নির্মিত তাজিয়ার স্থান) নির্মাণ করে এবং তারা সকলে তাজিয়ার স্থানে সমবেত হয়। এতে দেখা যায় যে, ষোড়শ শতকের বাংলায় মহররমের শোভাযাত্রার প্রথা প্রচলিত ছিল।

ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও হুগলীতে ইমামবারাগুলোর অস্তিত্ব থেকে বুঝা যায় যে, সুবাদার ও নবাবদের আমলে এই শহরগুলোতে মুহররম উদযাপিত হত[১৯]। আলম মুসাওয়ার কর্তৃক অঙ্কিত উনিশ শতকের প্রথম দিকের একটি চিত্রে এবং হাকিম আহসানের একটি বর্ণনায় ঢাকায় মহররম উৎসব উদযাপনের প্রমাণ মেলে[২০]। মহররমের চাঁদ দেখার সঙ্গে সঙ্গে উৎসব শুরু হতো এবং সেই রাত্রি থেকে ইমামবারার 'নওবত খানা'য় নওবতের (সঙ্গীত) সুর বাজান হতো। সেই সময় থেকেই মাতমে মজলিশ শুরু হতো। ইমামবারার দেয়ালে মোমবাতি জ্বালান হতো[২১]।

ঢাকায় শিয়া মতাবলম্বীদের আগমনের ইতিহাস অনেক প্রাচীন। বাংলা অঞ্চলে মোঘল আমলে শিয়া আগমন ও প্রচার-প্রভাব বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া যায়। বিশেষ করে শায়েস্তা খাঁর আগে লক্ষাধিক মুসলমানদের মধ্যে প্রায় ৭৫% শিয়া ছিলেন। শিয়ারা বণিক ও ধর্ম প্রচারক হিসেবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলে আগমন করে। শিয়া উত্থানে এ বাংলা অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিল নায়েব নাজিমদের তত্ত্বাবধানে। তখন রাষ্ট্রীয়ভাবে শহরাঞ্চলে মহররম উদযাপিত হতো। এরপরই নবাব সলিমুল্লাহ হোসনী দালানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ঢাকার লালবাগ এলাকায় শিয়াদের বেশ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। পাকিস্তান আমলে প্রায় লক্ষাধিক বিহারি শিয়া দেশের

---

[১৮] এম,এ, রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-২০০
[১৯] A.H. Dani, A Record of Its Changing Fortunes, Dacca: 1962, P-90
[২০] এম,এ, রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-২০০
[২১] এম,এ, রহিম, প্রাগুক্ত, পৃ-২০২

বিভিন্ন স্থানে অবস্থান নেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর অধিকাংশ শিয়া পাকিস্তানে চলে যান। তবে, স্থানীয়রা শিয়া মতবাদ গ্রহণ করার ফলে ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাস শুরু করেন।

শিয়া মহিলাদের নামকরণের ক্ষেত্রে আহলে বাইতের মহিলাদের নাম অনুসারে বেশিরভাগ নাম রাখা হয়[২২]। যেমন ফাতেমা জোহরা, নাফিসা ফাতেমা, কুলসুম, রোকাইয়া ও ছকিনা। বিবাহের ক্ষেত্রে শিয়া মহিলাদের প্রথম পছন্দ শিয়া ছেলে। তবে সুন্নীদের মধ্যেও বিবাহকে তারা অবৈধ মনে করে না। আহলে হাদিসদের সঙ্গে তাদের বিবাহ হয় না। শিয়া মহিলারা প্রয়োজনে-বিপদে-আশা পূরণে শিরনি-নিয়াজ মানত করতে অভ্যস্ত। শিশুদের প্রতি মায়েদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব বারো ইমামের নাম, জন্ম তারিখ মুখস্থ করানো এবং আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসার শিক্ষা দেয়া।

দীর্ঘ ছয় দশক ধরে শিয়া মুসলমানরা খুলনা অঞ্চলে বসবাস করছেন। শুরুতে তাদের ভাষা, শিক্ষা, পেশা ও সামাজিক জীবনযাত্রায় যে সব সমস্যা ছিল তা এখন তারা কাটিয়ে উঠেছেন। এ অঞ্চলের প্রায় ৪০ হাজার শিয়া অনুসারী অন্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিলেমিশে আধুনিক জীবনযাত্রায় এগিয়ে চলেছেন। ১৯৪৭-এ দেশ ভাগের সময় ভারতের লক্ষ্মৌ ও মুর্শিদাবাদ থেকে শিয়া সম্প্রদায়ের অনুসারিরা প্রথম খুলনায় আসেন। তারা খুলনার আলতাপোল লেন ও খালিশপুর এবং যশোর শহর ও নড়াইলে বসবাস শুরু করেন। ১৯৫৪ সালে আলতাপোল লেনে একটি ইমামবারা প্রতিষ্ঠা করা হয়। খুলনার খালিশপুর, যশোর, সাতক্ষীরা এবং নড়াইলেও অনুরূপ ইমামবারা রয়েছে। ১৯৪৭-এর আগেই খুলনার সাতক্ষীরায় কিছু সংখ্যক লোক প্রথম শিয়া মতবাদে দীক্ষিত হন। ব্রিটিশ আমলে তিতুমীরের অনুসারীরা সাতক্ষীরাতে এসে এ মতবাদ প্রচার করেন। শ্যামনগর ও দেবহাটা উপজেলাতে কিছু বাঙালী শিয়া মতবাদের দীক্ষা গ্রহণ করেন ।

---

[২২] আতিয়ার পারভেজ, খুলনা শিয়া ও মহররম অনুষ্ঠান, ঢাকা-২০০৭

শুরুতে খুলনা, যশোর ও নড়াইল জেলার শিয়ারা ছিলেন উর্দুভাষী। তারা বাংলা জানতেন না। সাধারণ মানুষের সহযোগিতা নিয়ে উর্দুভাষী শিয়ারা বাংলা ভাষা শিখতে শুরু করেন। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত খুলনা জিলা স্কুলে উর্দু ভাষায় পাঠদান হতো। স্বাধীনতার পর উর্দু মাধ্যম বন্ধ করে দেয়া হয়। শুরুতে শিয়ারা মূলত ব্যবসা করত। কিছু উচ্চশিক্ষিত শিয়া অনুসারী সরকারি চাকরি করত। এখন তারা বিভিন্ন পেশায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। কিছু শিয়া উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে বিদেশেও বসবাস করছেন। শিক্ষা ও পেশাগত সমস্যা ছাড়িয়ে শিয়াদের সামাজিক জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। সুন্নি মুসলমানদের সঙ্গে তাদের সামাজিক জীবন উন্নত হয়েছে। হরহামেশাই দুই অনুসারীদের মধ্যে বিয়ে হচ্ছে। এছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সামাজিক জীবন ঘনিষ্ঠ হয়েছে। শিয়া সম্প্রদায়ের বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই জানে না এক সময় তাদের পূর্ব পুরুষ উর্দুভাষী ছিলেন। বর্তমান প্রজন্ম জানেন তাদের পরিচয় শুধু বাঙালি।

চতুর্থ অধ্যায়

ইতিহাসের ক্রমানুযায়ী নিম্নে রাজধানী ঢাকায় নির্মিত বিদ্যমান ইমাবারার স্থপত্যিক ইতিহাস ও ঐতি হ্য :

৪.ক. বিবিকা রওজা ১৬০০, ঢাকা :

নাজির হোসেন 'কিংবদন্তির ঢাকা' নামক বইয়ে 'বিবিকা রওজা'র উল্লেখ করেছেন যে 'বিবিকা রওজা' নামক একটি স্মৃতি স্তম্ভকে কেন্দ্র করে বিবিকা রওজা মহল্লার নামকরণ করা হয়[২৩]। মুনতাসির মামুন 'ঢাকা সমগ্র' গ্রন্থে 'বিবিকা রওজা'র উল্লেখ করেন। তিনিও এটিকে ঢাকার সবচেয়ে ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীন ইমামবারা বলে উল্লেখ করেছেন এবং আরো উল্লেখ করেন জনৈক আমীর খান তা নির্মাণ করেছিলেন ১৬০০ সালে অর্থাৎ ঢাকায় ইসলাম খাঁ রাজধানী স্থাপনের আগে[২৪]। ঢাকার সদরঘাট শ্যামবাজারে বি কে দাশ রোডের ফরাশগঞ্জে অবস্থিত পুরাতন ঢাকার আরেক ঐতিহ্য বিবিকা রওজা। এটিই ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীন ইমামবারা। বিবিকা রওজা ইমামবারা বর্তমানে পাকা ইটের তৈরী। বর্গাকৃতির এই ইমামবারা এক গম্বুজ বিশিষ্ট। ইমামবারার প্রবেশ পথ দু'টি একটি পুরুষদের জন্য অন্যটি মহিলাদের জন্য। এই ইমারতের অভ্যন্তরে রয়েছে বিবির (হযরত ফাতেমা) প্রতিকী মাজার। এই মাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে এই ইমামবারা। এই ইমামবারার সামনে যে বহুতল বিশিষ্ট ভবনটি চোখে পড়ে তা আসলে এই ইমামবারাকে কেন্দ্র করে যে সব ধর্মীয় আচার-উৎসব হয়ে থাকে তার জন্য নির্মিত হয়েছে। বিবিকা রওজা ইমামবারা আকারে খুব ছোট হলেও নজর কাড়ে পার্শ্বের ভবনটি। এটি নির্মানে চিনিটিকরির ব্যবহার করা হয়েছে। ভবনের দেয়ালে আরবী ক্যালিগ্রাফী রয়েছে। মূল ইমামবারার জানালা একবারে সাধারণ হলেও পার্শ্বের ভবনের জানালায় খিলানের ব্যবহার করা হয়েছে। ইমামবারার চত্বরে প্রবেশের জন্য বেশ কারুকাজ করা বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলান পথ রয়েছে।

---

[২৩] নাজির হোসেন, কিংবদন্তির ঢাকা, ঢাকা: ১৯৭৬, পৃ, ১০৩-৪

[২৪] মুনতাসির মামুন, ঢাকা সমগ্র-খন্ড-১, ঢাকা: ২০০৩-২০০৬ পৃ, ১৯৩

বাবলু মিয়া (৩০), বিবিকা রওজার বর্তমান খাদেম। এই ইমামবারার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে তিনি বলেন, বিবিকা রওজা হযরত ফাতেমা (রাঃ) নামানুসারে সুন্নি জামাত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত[২৫]। কিংবদন্তী অনুযায়ী একদিন জনৈক আমীর খাঁর মাতা মনি বিবি স্বপ্নে আদেশ পান- যেন ঐ স্থানটি পরিষ্কার করে রাখা হয়। তারপর দেখা যায় একটি ছোট্ট রওজা মাটি গর্ভ থেকে ওঠে, এটি ছিল স্বর্ণের তৈরি। ডাচ ও পুর্তুগীজ জলদুস্যদের ভয়ে স্বর্ণের রওজাটিকে মাটি দ্বারা ঢেকে রাখা হত। এই ইমামবারায় এখনও দশ দিনব্যাপী মহররমের অনুষ্ঠান হয়। মহররমের নয় তারিখের সন্ধ্যায় মিছিল বের হয় এবং ভোর রাত্রে হায়দারী গাস্ত হয়। দশ তারিখ আশুরার দিন বিকেলে বোলতা গাওরা তথা লাল, সবুজ ও কালো পতাকা সহকারে তাজিয়া মিছিল বের হয়[২৬]।

এই মিছিল বের হওয়ারও একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে, দুপুর গাড়াতেই রওজার খাদেম সেজদায় চলে যেতেন এবং যখন তিনি গায়েবি আদেশ পেতেন তখন সেজদা থেকেই উঠাও বলে আওয়াজ দেন। সমবেত ভক্তরা তখন পাগলের মত তাজিয়া নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে ফরাশগঞ্জ হতে চকবাজার আজিমপুর হয়ে ধানমণ্ডির ঈদগাহ পুকুরে নিয়ে আসেন এবং বিসর্জন করে মিছিলের সমাপ্তি করেন। এতে ভক্তরা মানত করে দান করেন কবুতর, মুরগী, টাকা-পয়সা। এমনকি সোনা-চাঁদির দ্রব্যাদিও ফেলে মানত পূর্ণ করেন। এ ব্যাপারে বর্তমান খাদেম বলেন, পূর্বে এমন হতো বলে আমাদের পূর্ব পুরুষদের মুখে শুনেছি। বিবিকা রওজা ইমামবারকে আজও শিয়া-সুন্নী মুসলমান এমনকি হিন্দুসহ অন্যান্য ধর্মের ভক্তরাও শ্রদ্ধা করেন। প্রকৃত পক্ষে এই ইমামবারাটি ঢাকার প্রাচীন ইমামবারা যা হোসেনী দালান ইমামবারার প্রায় অর্ধশত বছর পূর্বে নির্মিত[২৭]।

---

[২৫] বাবলু মিয়া (৩০), বিবিকা রওজার বর্তমান খাদেম

[২৬] A.H. Dani, A Record of Its Changing Fortunes, Dacca, 1962, P-95

[২৭] নাজির হোসেন, কিংবদন্তির ঢাকা, ঢাকা: ১৯৭৬, পৃ, ১০৩-৪

মহররমের অনুষ্ঠান :

হোসেনী দালান ইমামবারার মত বুড়িগঙ্গার তীরে অবস্থিত বিবিকা রওজা ইমামবারায় মহররমের প্রথম দিন থেকেই মজলিস ও অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। নয়ই মহররম সন্ধ্যায় এখান থেকে এক মিছিল বের হয়। মিছিলটি শ্যামবাজার, লালকুঠি, সদরঘাট টার্মিনাল, চাইনা মার্কেট, ইসলামপুর পুলিশ ফাঁড়ি, পাটুয়াটুলি, সদরঘাট ওভার ব্রিজ, ভিক্টোরিয়া পার্ক, লক্ষী বাজার হয়ে ইসলামপুর, সুত্রাপুর হয়ে আবার বিবিকা রওজা ইমামবারায় ফিরে আসে।

১০ই মহররম আশুরার দিন বিকেলে এখানকার সবচেয়ে বড় মিছিলটি বের হয়। মিছিলটি প্রথমে যায় সদরঘাট, ইসলামপুর, বাবুবাজার, মিটফোর্ড, চকবাজার, চুড়িহাট্টা হয়ে লালবাগ, আজিমপুর হয়ে নিউমার্কেট, মিরপুর রোড দিয়ে ধানমণ্ডি ২ নম্বর সড়ক হয়ে ঝিগাতলার কারবালাতে (ঢাকার এই স্থানটিকে শিয়ারা এই নামে ডাকে) গিয়ে শেষ হয়।

এই মিছিলটি এত বিরাট হয়, যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। এর বিশেষত্ব হল- ফরাশগঞ্জ থেকে আরম্ভ হয়ে কারবালা পর্যন্ত না পৌছা পর্যন্ত মিছিলে অংশগ্রহণকারী সবাই দৌড়াতে থাকেন।

৪.খ. হোসেনি দালান ইমামবারা, ঢাকা :

রাজধানী ঢাকার চানখাঁরপুল পার হয়ে পশ্চিমে যে রাস্তাটি ধরে সামনে গেলে চোখে পড়বে ঘরবাড়ি ও দোকানের ছাদে কালো নিশান আর মোঘল স্থাপত্যরীতির বিশাল একটি ফটক। ভেতরে খোলা চত্বর। এটি ঢাকার প্রধান ইমামবাড়া। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর দৌহিত্র ইমাম হোসেন (রা:) এর স্মরণে নির্মিত হয়েছে এই ইমামবারাটি। এই ভবনের নাম তাঁর নামানুসারেই হোসেনি দালান ইমামবারা। রাস্তাটির নামও হোসেনি দালান রোড।

ঢাকার হোসেনী দালান বাংলাদেশের প্রাচীনতম ইমামবারা। এটি পুরাতন ঢাকার একটি মনোরম ঐতিহাসিক নিদর্শণ। শুধু প্রাচীনত্বের দিক থেকেই নয়, হোসেনী দালান প্রতিষ্ঠার পিছনেও এক তাৎপর্যময় ইতিহাস রয়েছে। সে ইতিহাস যেমন ধর্মীয় বিশ্বাসে পূর্ণ, তেমনি অভিনব। প্রকৃতপক্ষে হোসেনী দালান বলে অতি পরিচিত এই ইমামবারাটি কারবালার শোকাবহ ঘটনার স্মরণে ইমাম হোসেনের শাহাদাতের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য নির্মিত। মূলত মহররমের অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে হোসেনী দালান শিয়াদের মিলন মেলায় পরিণত হয়। মহররমের প্রথম দশদিনে ইমাম হোসেনের প্রতি গভীর অনুরাগ নিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতে কয়েক লাখ শিয়া অনুরাগী হোসেনী দালান পরিদর্শন করে। সুতরাং ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের কাছে বিশেষ করে শিয়াদের কাছে এর তাৎপর্য অপরিসীম।

হোসেনী দালান ইমামবারাটি ঢাকা শহরের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। এটি ঢাকা জেলার লালবাগ থানায় অন্তর্গত। ঢাকা শহরের এই অংশের নাম হল পুরাতন ঢাকা। বুড়িগঙ্গা নদীর তীর থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত এই ইমামবারাটি। হোসেনী দালানের মূল সীমানার উত্তর দিক ঘেঁষে যাওয়া সড়ক হোসেনী দালান রোড নামে পরিচিত। পশ্চিমে রয়েছে বকশি বাজার আর পূর্ব দিক দিয়ে গেছে নাজিম উদ্দিন রোড। হোসেনী দালান প্রায় ৬.২ বিঘা (৮৯,২৮০ বর্গফুট/৮৪৫৩ বর্গমিটার) জমির উপর প্রতিষ্ঠিত[২৮]।

হোসেনি দালান ইমামবারা ঐতিহাসিকভাবেও ঢাকার একটি মূল্যবান স্থাপনা। প্রায় সাড়ে ৩০০ বছরের পুরোনো এই ইমারতটি বহন করছে মোঘল আমলের ঐতিহ্যের স্মৃতি। এর নির্মাণকাল নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমামবারার দেয়ালে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়, শাহ সুজার সুবেদারির সময় তাঁর এক নৌ-সেনাপতি মীর মুরাদ ১৬৪৮ সালে এটি নির্মাণ করেছিলেন। আবুল

[২৮] এম.এম ফায়েজ সিরাজী, হোসেনী দালান, ঢাকা: পৃ, ৩-২০

কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া তাঁর 'বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ' বইয়ে ভবনের দেয়ালে লাগানো শিলালিপির উল্লেখ করে বলেছেন, পরীক্ষার পর দেখা গেছে, শিলালিপিটি নকল নয়। জেমস টেলর তাঁর 'কোম্পানী আমলে ঢাকা' বইয়ে বলেছেন, এটি মীর মুরাদ নির্মাণ করেছেন। এ ছাড়া ঐতিহাসিক এএইচ দানীও বলেছেন, মীর মুরাদই এখানে প্রথম ছোট আকারের একটি উপাসনালয় স্থাপন করেছিলেন। পরে এটি ভেঙে যায় এবং নায়েব নাজিমরা নতুন করে নির্মাণ করেন। তবে দানীর মতে, এটি ঢাকার প্রথম ইমামবারা নয়[২৯]। ঢাকার প্রথম ও প্রাচীন ইমামবারা ছিল ফরাশগঞ্জে। যার নাম বিবিকা রওজা। আমীর খান নামের এক ব্যক্তি এটি নির্মাণ করেছিলেন ১৬০০ সালে, অর্থাৎ ইসলাম খানের ঢাকায় আসারও আগে। এ ছাড়া ঢাকায় এখন আরও বেশ কয়েকটি ইমামবারা রয়েছে। তবে হোসেনি দালান রোডের ইমামবারাটিই প্রধান বলে স্বীকৃত।

কথিত আছে, মীর মুরাদ স্বপ্নে আদৃষ্ট হয়ে হোসেনি দালান ইমামবারা নির্মাণ করেছিলেন। তবে সেটির আদিরূপ বজায় নেই। জেমস টেলব ১৮৩২ সালেও আদি ইমামবারা টিকে ছিল বলে উল্লেখ করেছেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমলে দু'দফায় ইমামবারাটির সংস্কার কাজ হয়। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে ভবনটি প্রায় প্রায় বিধ্বস্ত হয়। জনাব আহসানউল্লাহ এক লাখ টাকা খরচ করে ইমামবারার আমূল সংস্কার করেন। ইমামবারার দক্ষিণদিকে রয়েছে বড় একটি পুকুর। প্রায় ১.০১ বিঘা (১৪,৫৪৪ বর্গফুট/১৩৭৬.৯৫ বর্গমিটার) জমির ওপর বর্গাকৃতির পুকুরটি অনেক দিন সংস্কার না করায় সেটি প্রায় মজেই গিয়েছিল। প্রয়াত ঢাকার মেয়র মোহাম্মদ হানিফের উদ্যোগে ১৯৯৫ সালে পুকুরটি সংস্কার করে চারপশের দেয়াল কংক্রিট দিয়ে বাঁধাই করে দেওয়া হয়। পশ্চিম ও উত্তর দিকে রয়েছে পুকুরে নামার প্রশস্ত সিঁড়ি। চারদিক লোহার গ্রিল দিয়ে সংরক্ষিত করা আছে। পুকুরের টলটলে পানিতে শ্বেতশুভ্র ইমারতের ছায়া পড়ে বড় সুন্দর দেখায়।

---

[২৯] A.H. Dani, A Record of Its Changing Fortunes, Dacca, 1962, P-90

ইমারতটি পরবর্তীকালে নানা সংস্কার ও সম্প্রসারণের ফলে হোসেনী দালান ইমামবারা আজ বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। ১৮০৭ ও ১৮১০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উদ্যোগে ইমারতটির সংস্কার করা হয় এবং ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের পর এর কিছু অংশ নতুন করে পুনঃনির্মান করা হয়[৩০]। এই হোসেনী দালান একটি উঁচু মঞ্চের উপর উপর স্থাপিত। পূর্বদিকের একটি সিঁড়ির সাহায্যে ওই মঞ্চে উঠতে হয়। মূল ইমারতটি পাশাপাশি সংস্থাপিত দু'টি হলকক্ষ নিয়ে গঠিত। দক্ষিণমুখী 'শিরনি' হলটি ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের মৃত্যুর জন্য দুঃখ ও শোক প্রকাশের উদ্দেশ্যে কালো রঙ করা হয়েছে। অন্যদিকে উত্তরমুখী খুতবা হল রয়েছে। এই দু'টি হলের ডানে ও বামে সম্ভবত মহিলাদের জন্য দ্বিতল বিশিষ্ট সম্পূরক হলকক্ষ নির্মিত হয়েছে। ইমারতের দক্ষিণ ফ্যাসাদে ত্রিতল বিশিষ্ট দুইটি খোলা বুরুজ দ্বারা বিভূষিত । বুরুজসমূহ গম্বুজ দ্বারা আবৃত। দুই বুরুজের মধ্যবর্তী বারান্দার উর্ধ্বাংশে তুসকান স্তম্ভ দ্বারা সুশোভিত। হোসেনী দালান ইমামবারার প্যারাপেট রঙ্গীন পুষ্প-পত্র দ্বারা অলংকৃত এবং চার কোনের চারটি ছত্রি এই ইমামবারার শোভা বর্ধন করেছে[৩১]। সম্মুখ ভাগের বিস্তৃত অংশে ইট ও প্লাস্টার দ্বারা নির্মিত চারটি স্তম্ভ বহন করছে ছাদ ও বারান্দার ভার[৩২]। দক্ষিণ বারান্দা ভার বহনকারী চারটি ধ্রুপদি স্তম্ভ ইউরোপিয় স্থাপত্য-রীতির বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত[৩৩]।

পূর্ব দিকের সিঁড়ি দিয়ে মঞ্চে উঠে ইমামবারায় প্রবেশ করতে হয়। পাশাপাশি দু'টি ঘর। দক্ষিণমুখী ঘরটি শিরনি হল, উত্তরমুখী ঘরটি খুতবা হল। খুতবা হলে রয়েছে সাত ধাপের মিম্বর, তাজিয়া, ঢাল, তলোয়ার, নিশান, মশক, চোলি, পাক-পাঞ্জাতনসহ ধর্মীয় বিভিন্ন প্রতীক। অসাধারণ কারুকাজ করা মূল তাজিয়াটি রুপার তৈরি, নবাব স্যার সলিমুল্লাহ এটি তৈরি করেছেন।

---

[৩০] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলাপিডিয়া খণ্ড-১০, ঢাকা: ২০০৩, পৃ. ৫১৩

[৩১] এবিএম হোসেন, স্থাপত্য, খণ্ড-২, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,২০০৭, পৃ, ৪১৮

[৩২] A.H. Dani, Muslim Architecture in Bengal, Dacca: 1961, P, 203-205

[৩৩] পারভিন হাসান, স্থাপত্য ও চিত্রকলা, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০, পৃ, ৫৭৯-৬৩৯

ইমামবারার অভ্যন্তরে বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলান রয়েছে এবং খিলানে লতাপাতাসহ আরবী ক্যালি গ্রাফী রয়েছে। বারান্দার খিলানও বহুখাঁজ বিশিষ্ট এবং খিলানের তলদেশে আরবী ক্যালিগ্রাফী এবং খিলানের ওপরে পদ্ম পাপড়ির অলংকরন শোভা পাচ্ছে। হোসেনী দালান ইমামবারার ফ্যাসাদে যে স্তম্ভ ছাদের ভার বহন করছে তাতে দেশজ লতাপাতা ও আরবী ক্যালিওগ্রাফী রয়েছে।

উত্তর দিকের খোলা মাঠের পূর্বাংশে ফলদ ও বনজ গাছের সারি। পশ্চিমে কবরস্থান। ভরে আছে মৌসুমি ফুলে। নাম-ফলকহীন আটটি কবর আছে এখানে। অন্তত চারজন নায়েব নাজিমেরে নাম জানা যায় যথাক্রমে (ক) নওয়াব নুসরাত জঙ ১৭৯৬-১৮২৩ খ্রিস্টাব্দ (খ) নওয়াব সামসুদ্দৌলা ১৮২০-১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ (গ) নওয়াব কামরুদ্দৌলা ১৯৩২-১৮৪২ খ্রিস্টাব্দ (ঘ) নওয়াব গাজী উদ্দীন হায়দার ১৮৩৬-১৮৪২ খ্রিস্টাব্দ[৩৪]।

আজ থেকে ৩৫২ বছর আগের কথা শাহ সুজা তখন ঢাকার সুবেদার। মীর মুরাদ যেমন সুদক্ষ সেনাপতি ছিলেন, তেমনি ছিলেন ধার্মিক। কথিত আছে, এক রাতে মীর মুরাদ স্বপ্নে দেখলেন হযরত ইমাম হোসেন (রা:) কারবালার শোকাবহ ঘটনার স্মরণে এক অনুপম স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছেন। স্বপ্নে মীর মুরাদ ইমাম হোসেন (রা:) এর নির্দেশ পেলেন তিনিও যেন একটি অনুপম স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেন। মীর মুরাদ স্বপ্নের নির্দেশ অনুযায়ী ১০৫২ হিজরী মোতাবেক ১৬৪২ খ্রিস্টাব্দে এই ঐতিহাসিক হোসেনী দালান ইমামবারা নির্মাণ করেন। ঐতিহাসিক হোসেনী দালান মুঘল আমলের একটি দৃষ্টিনান্দনিক স্থাপত্য[৩৫]। মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের সময় তিনি হোসেনী দালান নির্মাণ করেছিলেন। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় ভূমিকম্প হলে এই ভবনের প্রথম তলা ধ্বসে পড়ে, পরে নওয়াব স্যার আহসানউল্লাহ কর্তৃক ৯৯,০০০ রুপি ব্যয়ে হোসেনী দালান পুনরায় নির্মিত হয়েছিল।

---

[৩৪] এম.এম ফায়েজ সিরাজী, হোসেনী দালান, ঢাকা: পৃ, ১৯

[৩৫] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলাপিডিয়া খণ্ড-১০, ঢাকা: ২০০৩, পৃ. ৫১৩

আশুরা পালন :

১লা মহররম হতে ১০ই মহররম পর্যন্ত রাত্রি বেলা মজলিস হয়ে থাকে। প্রায় দেড় ঘন্টা মজলিস হওয়ার পর নওহা ও মাতম অনুষ্ঠিত হয। শুধু তাই নয় ১১ই মহররম থেকে ৮ রবিউল আউয়াল পর্যন্ত নিয়মিত হয় সেই মজলিস, নওহা মাতমের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বর্তমানে হোসেনী দালান ইমামবারার প্রধান ইমাম মাওলানা সৈয়দ রাশেদ হোসাইন যায়দী। তিনিই এখানকার যাবতীয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন এবং মজলিসের প্রধান থাকেন। প্রায় ২২/২৩ বছর যাবৎ তিনি এখানকার মহররমের অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত আছেন। সুদূর লক্ষ্ণৌ থেকে এসে তিনি এ পবিত্র দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। শুধু হোসেনী দালান ইমামবারার প্রধানের দায়িত্ব পালন নয়, তিনি সমগ্র বাংলাদেশের শিয়া সম্প্রদায়ের মজলিশ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনের দিক নিদের্শনা দিয়ে থাকেন।

১লা মহররম থেকে ১০ ই মহররম পর্যন্ত ভক্তরা নেয়াজ বা শিরনি স্বরূপ মোমবাতি, আগরবাতি, গোলাপজল, আতর, ফুল, ফুলের মালা, তোড়া, টাকা-পয়সা, সোনা, রূপা, মিষ্টি ও খাদ্য সমাগ্রী, গরু ছাগল, মুরগী, কবুতর ইত্যাদি এই ইমামবারায় দান করে থাকেন। তারই পাশাপাশি দালান চত্তরের আশে পাশে এক বিরাট মেলা বসে। এতে খাদ্য সামগ্রী ও মিষ্টির দোকান, খেলনা গৃহিনীদের ঘর সাজানোর সামগ্রী সবই পাওয়া যায়।

মহররমের ৫ ও ৭ তারিখে বেলা দু'টায় আঞ্জুমান এ হায়দারীর উদ্যোগে বিরাট আলম (পতাকা) মিছিল বের হয়। যা হোসাইনী দালান ইমামবারা থেকে সেক্রেটারিয়েট রোড, গুলিস্তান সিনেমা হলের সামনে থেকে নওয়াবপুর রোড, বংশাল রোড, আবুল হাসনাত রোড, সেন্ট্রাল জেলের সম্মুখ হয়ে নাজিমুদ্দীন রোড হয়ে সন্ধ্যার সময় আবার হোসেনী দালান ইমামবারায় ফিরে আসে। এছাড়া আঞ্জুমান-এ হায়দারীর উদ্যোগে হোসেনী দালান ইমামবারা থেকে আরও দু'টি মিছিল বের হয়। একটি ইমাম

হোসেন (রা:) এর চেহেলাম উপলক্ষ্যে আর দ্বিতীয়টি ইমাম আলী (রা:) এর শাহাদাৎ দিবস উপলক্ষে ২ রমজানে সেই রাস্তাগুলো প্রদক্ষিণ করে হোসেনী দালান ইমামবারায় ফিরে আসে। বর্তমানে মিছিলগুলো মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ও কাজী মোঃ আনসার হোসেনের তত্ত্বাবধানে বের হয়।

৮ই মহররম সন্ধ্যায় হোসেনী দালান ইমামবারা থেকে মিছিল বের হয়। এ মিছিল বকশী বাজার, উমেশ দত্ত রোড, উর্দু রোড, চকবাজার, নাজিম উদ্দিন রোড হয়ে রাত্রিতে হোসেনী দালান ইমামবারাতে ফেরত আসে। এ মিছিলের প্রথমে থাকে পতাকাবাহী দল, পরপর পর্যায়ক্রমিকভাবে ঘন্টা বাদক দল, অশ্বারোহী দল, বেহেস্তের পতাকাবাহী ঝুলজানা, মাতম ও নোহার দল, কাসেদের দল, তাজিয়া বহনকারী দল, বিবির ডোলা, মর্সিয়ার দল, আলমবাহী দল, পঞ্চবাহী দল, বাদ্যযন্ত্র দল, দুলদুল, পাহাড়, জিঞ্জির মাতমকারীর দল, পাইকের দল, গঞ্জে শহীদান বহনকারী দল, ইত্যাদি সব মিলিয়ে ৫ থেকে ৬ হাজার লোক এ মিছিলে অংশ গ্রহন করেন[৩৬]।

৯ই মহররম দিবাগত রাত ২টার সময় মিছিল বের হয়। মিছিলটি নাজিম উদ্দিন রোড, সেন্ট্রাল জেল রোড, চক বাজার রোড, সার্কুলার রোড, রহমতগঞ্জ, ওয়াটার ওয়ার্ক রোড, চাঁদনীর ঘাট, উর্দুরোড, উমেশদত্ত রোড, বকশি বাজার রোড হয়ে খুব সকালে হোসেনী দালান ইমামবারায় ফিরে। এটিও ৮ই মহররমের অনুরূপ মিছিল।

ঢাকা তথা বাংলাদেশে ১০ই মহররম আশুরার সবচেয়ে বড় মিছিলটি বের হয় হোসেনী দালান ইমামবারা থেকে সকাল ১০ টায়। মিছিলটি বকশী বাজার, উমেশ দত্ত রোড, উর্দু রোড, লালবাগ রোড, এতিমখানা রোড, আজিমপুর (দায়রা শরীফ), বেবী আইসক্রিম হয়ে নিউ মার্কেট, মীরপুর রোড হয়ে ধানমণ্ডি ২নম্বর রোড হয়ে ঝিগাতলার

---

[৩৬] A.H. Dani, A Record of Its Changing Fortunes, Dacca, 1962, P-91

কারবালায় গিয়ে শেষ হয় এবং সেখানে মিছিলে বহনকৃত তাজিয়া, ফুল ও তবারক পানিতে ডুবানো (শিয়াদের ভাষায় ঠাণ্ডা করা) হয়[৩৭]।

বর্তমান অবস্থা :

ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে হোসেনী দালান ইমামবারা পর্যটকদের নিকট একটি চিহ্নিত স্থান। তাই স্বাভাবিক আকর্ষণ নিয়ে দেশী পরিদর্শক ও বিদেশী পর্যটকগণ হোসেনী দালান ইমামবারা পরিদর্শনে আসেন। কিন্তু চারিদিকের বিক্ষিপ্ত, বিবর্ণ, অবহেলিত রুপ দেখে তাদের আশাহত হয়ে ফিরে যেতে হয়। প্রবেশ পথে দোতালায় উঠার সিড়ির সামনে লর্ডকার্জনের সময়কার পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আদেশের একটি সাইনবোর্ড এখনও অটুট আছে।

উপরিউক্ত আলোচনার সূত্র ধরে বলা যায়, উপমহাদেশের প্রাচীনতম ইমামরত হল হোসেনী দালান ইমামবারা। প্রাচীন এই ইমামবারাটি সংরক্ষণের যথাযথ উদ্যোগের অভাবে ইমামবারার সৌন্দর্য হারাতে বসেছে। ধর্মীয় পবিত্রতা রক্ষা করে পর্যটকদের জন্য হোসেনী দালান ইমামবারাকে আকর্ষণীয় স্থানে পরিণত করা যায়। এই ইমারতের অনুপম গুরুত্বের কারণে হোসেনী দালান ইমামবারা শিয়া সম্প্রদায়ের জন্য দেশের প্রধান কেন্দ্র বিন্দু হিসেবে ইসলামিক ভাবাদর্শ বিস্তারে ভূমিকা রাখতে পারে ।

৪.গ. মোহাম্মদপুর ইমামবারা :

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে কেন্দ্রীয় কলেজ সংলগ্ন প্রায় ০.৫ একর জমির উপর প্রতিষ্ঠিত একটি মসজিদসহ আয়তকার ইমামবারাটি। এখানে ১৯৫৯-৬০ সন থেকে এখানে মহররমের অনুষ্ঠান পালন হয়ে আসছে। পাকা ইমামবারাটি ১৯৮২ সনে নির্মিত হলেও এখানে নেয় কোন আধুনিকতার ছোঁয়া। প্রায় ৬ কাঠার উপর নির্মিত

---

[৩৭] A.H. Dani, A Record of Its Changing Fortunes, Dacca, 1962, P-94

ইমামবারাটিতে রয়েছে ৫টি প্রবেশপথ, নেই কোন জানালা। হোসেনী দালানের ন্যায় এখানেও ১লা মহররম হতে শোক মজলিসের ব্যবস্থা থাকে। মোহম্মদপুর ইমামবারায় সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টা এবং বিকেল ৪টা থেকে ৬টা পর্যন্ত আর ৯ই মহররম পর্যন্ত মহিলাদের মজলিস চলে। একইভাবে সন্ধ্যা ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত পুরুষদের জন্য মজলিসের ব্যবস্থা থাকে। এই ইমামবারা থেকে প্রথম মিছিলটি বের হয় ৬ই মহররম। মিছিলটি মোহাম্মদপুর এলাকার বিভিন্ন সড়ক প্রক্ষিণ করে আছাদগেট হয়ে নূরজাহান রোড ঘুরে পুনরায় আগের জায়গায় ফিরে আসে। ১০ই মহররম আশুরার দিন বের হয় বড় মিছিলটি। যা এই ইমামবারা থেকে বের হয়ে নূরজাহান রোড, আছাদগেট, মানিক মিয়া এভিনিউ, ফার্মগেট, পুরানো এয়ারপোর্ট রোড, ড্রাম ফ্যাক্টরী হয়ে নাখাল পাড়ায় অবস্থিত কারবালায় গিয়ে শেষ হয়[৩৮]।

১লা মহররম হতে ১০ই মহররম ইমামবারায় ভক্তের উপস্থিতি বেশি থাকে এর ফলে দান-মানতের দৃশ্য থাকে অন্যরকম। তাছাড়া বছরের সারা সময় ধরে শিয়া-সুন্নী সম্প্রদায়ের ভক্তরা মান্নত বা দান স্বরূপ টাকা-পয়সা, মোমবাতি, আগরবাতি, গোলাপ জল, ফুল, ফুলের মালা, শিরনি, মিষ্টি ও খাদ্য সমাগ্রী, মুরগী ও কবুতর ইত্যাদি ইমামবারায় দান করে থাকেন।

৪.ঘ. মগবাজার ইমামবারা, ঢাকা :

রাজধানী ঢাকার মগবাজার বেলালাবাদ কলোনিতে মগবাজার ইমামবারা অবস্থিত। এই ইমামবারাটি পাকিস্তান আমলে ১৯৫৩ সালে নির্মিত আয়তকার ছাদ যুক্ত একটি পাকা ইমারত। যার আদি রূপ এখনো টিকে আছে। আয়তকার ইমামবারাটির পশ্চিম দিক ছাড়া বাকি তিন দিকে বারান্দা আছে। পবিত্রতা রক্ষার জন্য বারান্দায় লোহার গ্রিল দেয়া আছে। সমতল ছাদযুক্ত এই ইমামবারাটির উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সাতটি করে দরজা রয়েছে। পূর্ব দিকেও রয়েছে তিনটি দরজা এবং

[৩৮] জনাব শামীম আহাম্মেদ (৫৫), মোহাম্মদপুর ইমামবারা আশুরা পালন কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান

পশ্চিম দিকে আছে তিনটি জানালা। এই ইমামবারার অভ্যন্তরে আছে একটি সিঁড়ি যুক্ত মিম্বর এবং জারি খানা। এখানে ধর্মীয় মজলিসের সময় পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ইমামবারা অভ্যন্তরে আলাদা ব্যবস্থা করা হয়[৩৯]।

ঢাকার ব্যস্ততম এলাকা মগবাজার ইমামবারায় মহররমের অনুষ্ঠান পালন করা হয়। এই ইমামবারায় মহররমের প্রথম দিন থেকে ৯ই মহররম পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যার পর পুরুষদের নওহা, মাতম ও মজলিস হয়। দিনে মহিলাদের জন্যও মজলিসের ব্যবস্থা থাকে। ঢাকার অন্যান্য ইমামবারা মত আশুরার দিন মগবাজার ইমামবারা থেকেও তাজিয়াসহ কাল, সবুজ পতাকার বিশাল মিছিল বের হয়। মিছিলটি মগবাজার থেকে নিউ ইস্কাটন রোড, বাংলা মটর, ময়মনসিংহ রোড, ফার্মগেইট, পুরাতন এয়ার পোর্ট, ড্রাম ফ্যাক্টরী হয়ে নাখাল পাড়ায় অবস্থিত কারবালায় গিয়ে শেষ হয়।

৪.ঙ. মিরপুর ইমামবারা :

রাজধানীর মিরপুর এগার নম্বরে ব্লক-ডি, লাইন ২৭ এ রয়েছে শিয়া সম্প্রদায়ের পবিত্র ইমামবারা। প্রায় ১০০ বছরের পুরনো এই ইমামবারাটি প্রথমে ছোট আকারে টিনের খুপরি ঘর ছিল। যা এখন ছোট আকারে একটি স্থায়ী পাকা ইমারত। সারা বছর অবহেলায় পড়ে থাকলেও প্রাণ ফিরে পায় প্রতি বছর মহররম মাসে আশুরার সময়। মহররম মাসে এটিকেও দেশের অন্যান্য স্থানের ইমামবারার মত করে জাঁকজমকের সাথে সাজানো হয়। এখানে তৈরী করা হয় তাজিয়া। ১লা মহররম হতে ১০ই মহররম পর্যন্ত রাত্রি বেলায় ছোট আকারে মজলিসের আয়োজন থাকে। নিয়মিত এই মজলিসে নওহা মাতমের অনুষ্ঠান চলতে থাকে এবং এই ১০ দিন শিয়া-সুন্নী সম্প্রদায়ের ভক্তরা মানত বা দান স্বরূপ মোমবাতি, আগরবাতি, গোলাপ জল, আতর, ফুল, ফুলের মালা, তোড়া, টাকা-পয়সা, শিরনি, মিষ্টি ও খাদ্য সমাগ্রী, মুরগী ও কবুতর ইত্যাদি ইমামবারায় দান করে থাকেন। মহররমের মূল মিছিলটি বের হয় আশুরার দিন[৪০]।

---

[৩৯] এনায়েত হোসেন (৫৭), প্রধান ইমাম, মগবাজার ইমামবারা

[৪০] মোহাম্মদ ছামিম (৩৫), অস্থায়ী খাদেম, মিরপুর ইমামবারা

৪.চ. খোজাশিয়া ইসনা আশারী জামাত, পল্টন, ঢাকা :

ঢাকার পল্টনে অবস্থিত খোজাশিয়া ইসনা আশারী জামাত ইমামবারা। বাইরে থেকে দেখতে এটিকে একটি টিনের ঘরই মনে হবে। ইমামবারার উপরে টিনের চালা আর দেয়াল পাকা ইট দ্বারা নির্মিত। বছরের সারা সময় এখানে তেমন কোন কিছু চোখে পড়ে না। কিন্তু প্রতি বছর মহররম মাসে খোজশিয়া ইসনা আশারী জামাত ইমামবারায় বা পল্টন ইমামবারায় মহররমের অনুষ্ঠান পালিত হয় জাঁক-জমকের সঙ্গে। পল্টন ইমামবারায় মহররমের প্রথম দিন থেকে ৯ই মহররম পর্যন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যার পর পুরুষদের নওহা, মাতম ও মজলিস হয়। দিনে মহিলাদের জন্যও মজলিসের ব্যবস্থা থাকে। মহররমের অষ্টম দিনে যোহরের নামাজের পর এই ইমামবারা থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিলটি জিপিও, গুলিস্তান, নওয়াবপুর রোড, বংশাল, নাজিমউদ্দীন রোড হয়ে হোসেনী দালান ইমামবারায় এসে শেষ হয়। ঢাকার অন্যান্য ইমামবারা মত আশুরার দিন এই ইমামবারা থেকেও তাজিয়াসহ কাল, সবুজ পতাকার বিশাল মিছিল বের হয়। মিছিলটি বিজয় নগর, কাকরাইল, সার্কিট হাউস রোড, মগবাজার বাজার রোড, নিউ ইস্কাটন রোড, বাংলা মটর, ময়মনসিংহ রোড, ফার্মগেইট, পুরাতন এয়ার পোর্ট, ড্রাম ফ্যাক্টরী হয়ে নাখাল পাড়ার কারবালায় গিয়ে শেষ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ইতিহাসের ক্রমানুযায়ী নিম্নে বাংলাদেশের বিদ্যমান অন্যান্য ইমাবারার স্থাপত্যিক ইতিহাস ও ঐতি হ্য :

৫.ক. মাধৈল ইমামবারা, নওগাঁ :

নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলার মাধৈল গ্রামে এই ইমামবারাটি অবস্থিত। এটি বাংলাদেশে অষ্টভুজ ইমামবারার একটি দুর্লভ উদাহরণ। ইমারতটি আকারে বেশ ছোট। তার ভিতের প্রতি বাহুর দৈর্ঘ ৫.১ মিটার। ভিতের ন্যায় মূল ইমামবারাটিও অষ্টভুজাকৃতির । তার প্রতি বাহুতে একটি করে খিলান দরজা আছে । খিলান শ্রেণীর অভ্যন্তরে আরো একটি অষ্টভুজাকৃতির নকশা রয়েছে। আর এই দুইয়ের মধ্যবর্তী স্থানে ১.২ মিটার চওড়া একটি বারান্দা আছে। মাধৈল ইমামবারা এক গম্বুজ বিশিষ্ট। বারান্দাটির অভ্যন্তরে ছাদ খিলানে কিন্তু বর্হি:দিকে ছত্রি ছাদে আবৃত ছিল। এই ইমামবারায় প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে কয়েকটি ধাপের একটি সিঁড়ি ছিল, যা বর্তমানে প্রায় বিলুপ্ত। ইমারতটি মোঘল ঐতিহ্যে নির্মিত। তার অষ্টভুজাকৃতি নকশা, শিরাল গম্বুজ এবং বাইরের চালা ছাদ এই ইমামবারাকে সপ্তদশ বা অষ্টদশ শতাব্দীর একটি ইমারত হিসাবে পরিচিতি দেয়[৪১]।

স্থানীয় লোকজন জানান, অনেক আগে থেকেই এখানে মহররমের নানা অনুষ্ঠান হতে দেখেছেন। এই ইমামবারায় বছরের অন্যান্য সময় তেমন একটা ভক্তের আনাগোনা খুব একটা দেখা যায় না। তবে, মহররম মাসে দূর-দূরান্ত থেকে অনেক ভক্ত আসেন এখানে। মহররমের মিছিল বের হয় নানা রঙ এর পতাকা সহকারে।

৫.খ. ঠাকুরগাঁও ইমামবারা, ঠাকুরগাঁও :

পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র উপকুল বা মরু প্রান্তর কোনটিই নেই ঠাকুরগাঁ জেলায়। জেলার যে দিকে চোখ যায় শুধু বিস্তীর্ন সমতল ভূমি। বিরাট এলাকা জুড়ে রয়েছে ভারতের সীমানা। শত শত বছর আগে ভারত উপ-মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত এই

[৪১] এবিএম হোসেন, 'ইমামবাড়া' অন্তর্ভূক্ত/এবিএম হোসেন (সম্পা), স্থাপত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামলা-২, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ, ৪২০; ভূমি নকশার সূত্র ঐ

এলাকাগুলোতে নানা সংস্কৃতি নিয়ে গড়ে ওঠা জনপদের নমুনা পাওয়া যায়। এই জেলায় পাওয়া যায় যুগে যুগে গড়ে উঠা মানুষের বসতির বিচিত্র ইতিহাস আর প্রাচীন কীর্তিসমূহ। তাই এখনো কালের স্বাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে অনেক প্রত্নিদর্শন, যার একটি ঠাকুরগাঁ ইমামবারা। যা এই জেলার গৌরবময় ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে।

ঠাকুরগাঁও জেলায় সদর থানার রায়পুর ইউনিয়নের সিন্দুরনা গ্রামে অবস্থিত প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো ঠাকুরগাঁও ইমামবারা। ঠাকুরগাঁ সদর থেকে প্রায় ২০ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে সিন্দুরনা গ্রাম। গ্রামটির পূর্বদিকে শালবাড়ী মসজিদ থেকে ২০০ গজ উত্তরে ইমামবারার অবস্থান[৪২]। এই স্থাপত্যের গঠণশৈলী, ইটের ব্যবহার, উঁচু প্রবেশ পথ, পুরো দেয়াল দেখে ধারনা করা যায়, ঠাকুরগাঁও ইমামবারা তৈরি হয়েছে মোঘল আমলে। ষাটগম্বুজ মসজিদের মত এই ইমামবারাতেও দেখা যায় চৌচালার ব্যবহার। স্থাপত্যটি নির্মানে ব্যবহার করা হয়েছে আগুনে পোড়া ইট। ছাদে দেখা যায় চুন-সুড়কির ব্যবহার। যা এখন শুধুই দৃষ্টান্ত হয়ে সমসাময়িক অন্য একটি স্থাপত্যের সাথে মিল করে একটি সিদ্ধান্তে দাঁড়াতে হবে। এটি বিশেষ সময়ে বিশেষ ভূখণ্ডে বসবাসকারী মানুষের চিন্তা চেতনা ও কাজের বহিঃপ্রকাশ। ইমামবারাটির নির্মাণ সময়কাল নিদের্শক দু'টি শিলালিপি পাওয়া গেছে। একটি বাংলায় অন্যটি ফারসিতে লেখা। বাংলায় লেখা শিলালিপিটি মাটির তৈরী মসজিদের বাইরের পূর্ব দেয়ালে সংস্থাপিত আছে। তবে, আগে এই মসজিদে নামাজ আদায় করা হলেও এখন সেখানে জন্ম নিয়েছে পরগাছা। যা গোটা ইমামবারাটিকে ঢেকে রেখেছে। ফারসিতে লেখা শিলালিপিটি সিন্দুরনা গ্রামের অধিবাসী, হাকিমউদ্দীন আহমদ এর কাছে সংরক্ষিত আছে। বাংলায় লেখা শিলালিপিটিতে ১২১৫ এবং ফারসিতে লেখা শিলালিপিটিতে ১২১০ বাংলা সনের কথা উল্লেখ রয়েছে[৪৩]। কিন্তু উভয় শিলালিপির ভাষ্য অনুযায়ী শেখ মুহাম্মদ রাজ কর্তৃক এই ইমামবারাটি নির্মিত হয়েছিল। নির্মাতার পিতার নাম শেখ খায়ের উদ্দীন ও দাদার নাম শেখ সদর উদ্দীন বলে শিলালিপিগুলোতে উল্লেখ

[৪২] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), বাংলাপিডিয়া খণ্ড-১, ঢাকা: ২০০৩, পৃ. ৪১৬
[৪৩] সানিয়া সিতারা, ইমামবারা (ঠাকুরগাঁও), সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলাপিডিয়া খণ্ড-১, ঢাকা: ২০০৩, পৃ. ৪১৬

রয়েছে। স্থানীয় জনশ্রুতি থেকে জানা যায় যে, এরা পূর্ণিয়া জেলার শীতলপুর জমিদারের বংশধর শেখ চানের উত্তরসূরি।

একটি উঁচু ভিতের উপর আয়তাকার নির্মিত এই ইমামবারার ভিতরের দৈর্ঘ্য ৪ মিটার বা ১৩ ফুট ২ ইঞ্চি, প্রস্থ ২ মিটার ২০ সে.মি. বা ৭ ফুট ৩ ইঞ্চি। ইমামবারার মোট দরজার সংখ্যা ৬টি। মূল দরজা পূর্বদিকে। পূর্বদিকে দরজা রয়েছে ২টি, পশ্চিমে ২টি। উত্তর ও দক্ষিণে রয়েছে ১ টি করে দরজা। দরজার উচ্চতা ২ মিটার ২০ সে.মি. বা ৭ ফুট ৩ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১ মিটার বা ৩ ফুট সাড়ে ৩ ইঞ্চি। রয়েছে ১ মিটার (৩ ফুট ৩ ইঞ্চি) পুরু দেয়াল। দরজার কিছু উপর থেকে ছাদ পর্যন্ত আকৃতি কিছুটা পিরামিডের মতো।

আয়তাকার এক কক্ষ বিশিষ্ট ইমামবারার উচ্চতা প্রায় ৬.১০ মিটার। বাইরের দিক থেকে এর দৈর্ঘ্য ৫.৮০ মিটার এবং প্রস্থ ৩.৯৫ মিটার[৪৪]। এই ইমামবারার ছাদ দেশীয় চৌচালা আকৃতির আর কার্নিশ সমান্তরাল। আলোচ্য ইমামবারা তার খাঁজ-খিলান এবং গোলায়িত যুগ্ম স্তম্ভ সমভিব্যবহারে দেশীয় ঐতিহ্যবাহী এবং ইউরোপীয় বৈশিষ্ট্যে একটি ঔপনিবেশিক স্থাপত্য উদাহরণ হিসেবে পরিগণিত[৪৫]।

গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে মনে হয় মহররম উপলক্ষে তাজিয়ার আদলে বানানো হয়েছিল এই ইমামবারা। সিন্দুরনা গ্রামের ইমামবারাটি যেন জুবুথুবু হয়ে বসে থাকা একটি তাজিয়া। মহররম মাস এলেই মনে হয় এটি নড়ে চড়ে উঠবে। মহররমের সাজ সেজে জ্যান্ত হয়ে উঠবে। ইমামবারার কারুকাজ ছাদ পর্যন্ত থাকলেও বর্তমানে তা বোঝার উপায় নেই। সমস্ত ছাদে গাছ গজিয়ে ছাদের অবকাঠামো ঢেকে গেছে। তবে পশ্চিম দিকে সামনের দরজায় ফুলের নকশা খচিত কারুকাজ এখনো শোভা

---

[৪৪] সুফি মোস্তাফিজুর রহমান ও অন্যান্য, প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য, বাংলাদেশ সমিক্ষামালা-১, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭, পৃ, ৩২৯

[৪৫] এবিএম হোসেন, স্থাপত্য, খণ্ড-২, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি,২০০৭, পৃ, ৪১৯

পাচ্ছে। সামনের দরজার প্রায় ১২ ইঞ্চি উপরে ৩ টি ফলক ছিল। ওই এলাকার বাসিন্দা সাব্বির ২৫ জানান, তারই এক আত্মীয় ঠাকুরগাঁও জেলা স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক মরহুম মোঃ ইউসুফ, ফারসী ভাষায় লেখা দরজার উপরের মাঝের বড় ফলকটি ঢাকা জাতীয় যাদুঘরে জমা দিয়েছেন। ফারসী ভাষায় লেখা ফলকটির খোঁজ কেউ দিতে পারেনা। তৃতীয় ফলকটি এলাকার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মনসুর আলমের বাড়িতে সংরক্ষিত আছে। কালো পাথরের উপর এই ফলকটি বাংলা ভাষায়। চার লাইনের বাংলা লেখাগুলো প্রায় দুর্বোধ্য। বহু কষ্টে দু'একটা শব্দ 'মহমমদ' 'ইমামবারা' এবং '১২১৫ সাল' লেখাগুলো পড়া যায়। এই ফলকের দৈর্ঘ ১৪ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৭ ইঞ্চি।

স্থানীয় কয়েকজন বয়োজ্যেষ্ঠ জানান, পবিত্র মহররম মাসে ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে এখানে তাজিয়া মিছিল আগেও বের হতো, তারই ধারাবাহিকতায় এখনও এখানকার শিয়া মতানুসারীরা শোক আর মাতমের সাথে তাজিয়া মিছিল বের করে তবে এখানকার সুন্নিরাও তাতে অংশ নেয়। তাছাড়া গরু-খাসি জবাই করে সাত দিন যাবত এলাকার গরীবদের জন্য ভোজের আয়োজন করা হয়। ভগ্নদশার এই ইমামবারাটি মহররম মাস ছাড়া কারো দৃষ্টি আকর্ষণ তেমন একটা করে না। গাছে ঢাকা মরা কঙ্কালের মত ইমামবারাটি একদিন পুরোটাই ধসে পড়ে মাটিতে মিশে যাবে। হারিয়ে যাবে প্রায় ৩০০ বছরের পুরনো ঠাকুরগাঁ ইমামবারার ইতিহাস।

৫.গ. গড়পাড়া ইমামবারা, মানিকগঞ্জ :

মানিকগঞ্জ সদর থানার আলীনগর গ্রামে অবস্থিত গড়পাড়া ইমামবারা। মানিকগঞ্জ সদর থেকে প্রায় ৪ কি.মি. দূরে গড়পাড়া ইউনিয়নের অবস্থান। পীরের বসবাস্থানসহ ১৭ বিঘা জমির মধ্যে প্রায় ৬ বিঘা সমান জায়গার উপর মসজিদসহ বাংলাদেশের বিখ্যাত গড়পাড়া ইমামবারার অবস্থান। ইউনিয়নটির উত্তরে তিল্লি ইউনিয়ন এবং ধলেশ্বরী নদী প্রবাহিত। পশ্চিমে সিংজুরী ইউনিয়ন, দক্ষিণে দীঘি

ইউনিয়ন, পূর্বাংশে জাগীর ইউনিয়ন। উত্তরে ধলেশ্বরী নদী থেকে একটি ছোট খাল চান্দইর গ্রামটির মাঝখান দিয়ে এঁকে বেঁকে দক্ষিণে কালিগঙ্গায় গিয়ে মিশেছে[৪৬]।

তৎকালীন বৃটিশ ভারতের প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ পীরে কামেল হযরত মাওলানা শাহ আবদুর রহমান ওরফে লাল মিয়া ১৮২৬ খ্রিঃ বাংলার গড়পাড়ার আলী নগর গ্রামে আসেন এবং ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক ভাবে ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর সহধর্মীনির অনুপ্রেরণায় গড়পাড়ায় প্রথম মহররম পালন শুরু করেন। শাহ আবদুর রহমান (র:) শৈশবকালে তৎকালীন বৃটিশ-ভারতের ভাগলপুর ছাপড়া আরা, বাকীপুর ও মুজাফফরপুরে অবস্থান করে আরবী, ফারসী ও ইংরেজিতে অধ্যয়ন করেন এবং পঞ্চাশ বৎসরকাল পর্যন্ত তিনি মোজাফফরপুরে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে চাকুরিরত ছিলেন। ভাগলপুর নিবাসী পীরে কামেল আলহাজ্ব হযরত মৌলানা সৈয়দ শাহ এমদাদ আলী (র:)-এর নিকট বায়েত গ্রহণ করেন এবং তাঁর পীরের নির্দেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি পৈত্রিক নিবাস নিজগ্রামে আলীনগর প্রত্যাবর্তন করেন। হযরত মৌলানা শাহ্ আব্দুর রহমান (র:) ভারতের বিহার প্রদেশের ভাগলপুর জেলার মোজাফফরপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে করেন[৪৭]।

তাঁর সুযোগ্য ধর্মপরায়ণ সহধর্মীনি মোসাম্মৎ বিবি মরিয়ম পারিবারিক সূত্রে শিয়া মাজহাবের অনুসারি ছিলেন কিন্তু গড়পাড়া ইমামবারার প্রতিষ্ঠাতা আবদুর রহমান ওরফে লাল মিয়া সুন্নী মাজহাবের অনুসারি ছিলেন। তিনি গড়পাড়ায় প্রথমে কোন রকমে মহররম পালন করা যায় এমন একটি ঘরের ব্যবস্থা করেছিলেন। এখন এখানে গড়ে ওঠেছে ছাদযুক্ত পাকা ইটের ইমারত। সমতল ছাদযুক্ত ত্রিকক্ষ বিশিষ্ঠ আয়তকার ইমামবারা। একটি কক্ষে প্রতিষ্ঠাতা পীরের মাজার। একটিতে রাখা আছে মহররমের যাবতীয় জিনিসপত্র এবং প্রবেশ পথের প্রথমে ছোট একটি কক্ষে রয়েছে পুরানো একটি ঢঙ্কা (ঢোল)। ইমামবারার সামনের দিকে রয়েছে তিনটি প্রবেশ পথ ও তিনটি

[৪৬] এস.এম. ইলিয়াছ, ঐতিহাসিক কারবালা, ঢাকা: ২০০৩, পৃ, ১১৩
[৪৭] এস.এম. ইলিয়াছ, ঐতিহাসিক কারবালা, ঢাকা: ২০০৩, পৃ, ১১৪

জানালা। এই ইমামবারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা পীরদের মাজার ঘর ও একটি সুন্দর মসজিদে আধুনিকতার সব ছোঁয়া দেখা গেলেও মূল ইমামবারায় তেমন কিছুই দেখা যায় না। ভক্তদের সংখ্যা বেশি হওয়ায় ইমামবারা সামনের দিকে টিনের ছাউনি দেয়া আছে। আর ইমামবারার সামনে রয়েছে বিশাল খোলা জায়গা।

আবদুর রহমান (র) এর মৃত্যুর পর গড়পাড়া ইমামবারার দায়িত্ব পালন করছেন তাঁর দৌহিত্র বর্তমান পীর শাহ্ মোখলেছুর রহমান (পান্নু মিয়া)।

গড়পাড়ায় আশুরা :

মহররমের প্রথম চাঁদ ওঠার সাথে সাথে ইমামবারায় সংরক্ষিত এক বিরাট ঢঙ্কা বাজানোর মাধ্যমে কারবালার প্রান্তরে চিরঅম্লান শহীদদের স্মরণে গড়পাড়া ইমামবারায় শুরু হয় ধর্মীয় মজলিসের মধ্য দিয়ে আশুরার নানা অনুষ্ঠান। তার পরই সবার জন্য উন্মুক্ত করা হয় ইমামবারার অনুষ্ঠান। মহররমের প্রথম দিন থেকে ৯ই মহররম পর্যন্ত প্রতিদিন বিশেষ করে সকাল-সন্ধ্যায় চলে জারি, মর্ছিয়া, মাতম, জিকির ও তাজিয়া বানানোর কাজ। ভক্তদের মাঝে কারবালায় নিহত শহীদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমে প্রত্যহ হাদিস পাঠ এবং তাদের জীবনী আলোচনা করা হয়। ইমামবারার পীর বংশের সকলে এবং ভক্তদের অনেকেই শুধু নিরামিশ আহার করে ও মহররম মাসের প্রথম দিনে রোজা পালন শুরু করেন। মহররমের তৃতীয় বা চতুর্থদিন থেকে দূর-দূরান্তের হাজার হাজার ভক্ত ইমামবারায় আসতে শুরু করেন।

৭ই মহরম হতে ইমামবারার অন্দরমহলে মহিলাদের জন্য ধর্মীয় মজলিস, মর্ছিয়া মাতমের ব্যবস্থা থাকে। এখানে উল্লেখযোগ্য হল বর্তমান পীরের বর্ণনা অনুযায়ী- পীর ভক্ত তারা সকলেই সুন্নী।

তাজিয়া ও লাল, সবুজ, কালো পতাকা সহ কারবালার শহীদদের স্মরণে গড়পাড়া ইমামবারা থেকে আশুরার প্রথম মিছিলটি বের হয় ৯ই মহররম। ১০ই মহররম আশুরার দিন ইমামবারা রূপধারণ করে হাজার বছরের পুরনো দিনে সেই ঐতিহাসিক কারবালার মাঠে। ইমামবারার সামনে ও আশপাশের খালি জায়গা নানা রং এর হাজারো পতাকা শোভা পায়। যোহরের নামাজের পরপরই শুরু করা হয় মহররমের মিছিলের প্রস্তুতি। আশুরা পালন কমিটির প্রধান বা পীরের নির্দেশ পাওয়া মাত্র সুসজ্জিত মিছিলটি বের হয়।

১০ই মহররমের দিন হাজার হাজার মানুষ কারবালার স্মৃতি বিজড়িত লাল, সবুজ, কালো রঙের পতাকা, দুলদুল, তাজিয়াসহ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় আশুরার মিছিলটি বের হয় গড়পাড়া ইমামবারা থেকে মানিকগঞ্জ শহরের দিকে। মিছিলে অংশগ্রহনকারী হাজারো ভক্তবৃন্দ 'হায় হোসেন', 'হায় ইমাম' চিৎকার করে আকাশ বাতাস ভারি করে তোলে।

ইমামভক্তরা শহর প্রদক্ষিণ করে সন্ধ্যায় সরকারি দেবেন্দ্র কলেজ মাঠে মিছিলটি এসে সমবেত হয় এবং রোজাদারগণ ইফতার করেন ও কারবালার যুদ্ধের স্মৃতি স্মরণ করে লাঠি-তলোয়ার খেলা করা হয়। কলেজ মাঠে আখেরী মোনাজাত করে আবার একইভাবে 'হায় হোসেন', 'হায় ইমাম' মাতম করতে করতে মিছিলটি গড়পাড়া ইমামবারায় গিয়ে শেষ হয়।

আশুরার মেলা :

গড়পাড়া ইমামবারাকে কেন্দ্র আশুরা উপলক্ষে ৭ই মহররম থেকে ১১ই মহররম পর্যন্ত এই মেলার আয়োজন করা হয়। মেলায় মহররমের স্মৃতি বিজড়িত বই-পত্র, খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে খেলনা এবং ঘর সাজানোর জিনিসপত্র পাওয়া যায়।

৫.ঘ. পৃত্রিম পাশা, মৌলভী বাজার :

পৃত্রিম পাশা ইমামবারা মৌলভী বাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলায় নওয়াব বাড়ীতে অবস্থিত। স্থানীয় লোকজন মনে করেন এটি সেখানকার নওয়াবদের দ্বারা নির্মিত। এখানকার নবাব আলী আমজাদ খানের পূর্ব পুরুষগণ ইরান থেকে এদেশে আসেন। পৃত্রিম পাশা ইমামবারায় প্রথম মহররম উদ্‌যাপন শুরু হয় ষোড়শ শতকের শেষ দিকে[৪৮]। উঁচু ভিত্তি বা প্লাটফর্মের উপরে তিন কক্ষ বিশিষ্ট ইমামবারাটি পাকা ইটের তৈরী। উপরে টিনের ছাউনি রয়েছে। তিনটি কক্ষেই মহররমে ব্যবহৃত কাঠের নির্মিত তাজিয়াসহ মহররমের মিছিলে ব্যবহৃত সব ধরনের জিনিসপত্র রাখা আছে।

নওয়াব বাড়ীর এই ইমামবারাটির বর্তমান স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট দেখে প্রতীয়মান হয় এটি ঔপনিবেশিক আমলের তৈরী। এই ইমামবারায় মোঘল ও ঔপনিবেশিক রীতির মিশ্রন দেখা যায়। যেমন, একদিকে বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলানের ব্যবহার ও মোটা চারকোনাকৃতির পিলার। ফ্যাসাদে এবং ফ্যাসাদের বিপরীত দিকে সিঁড়ির দু'পার্শ্বে দুটি করে অষ্টকোনাকার অলংকৃত পিলার এবং তার শীর্ষদেশে অলংকৃত বাতিদান রয়েছে। ইমামবারার বাইরের এই পিলারের গায়ে জ্যামিতিক নকশাকৃত চিনিটিকরির কাজ দেখা যায়। ইমামবারার চার দিকে বারান্দা রয়েছে এবং বারান্দার অর্ধাংশ প্লাস্টারের জালি নকশা দ্বারা ঘেরা রয়েছে। আয়তাকার ইমামবারাটির উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পাঁচধাপ সিঁড়ি যুক্ত আছে। ইমামবারার মূল প্রবেশ পথ দক্ষিণ দিকে। ইমামবারাটির সিড়ি ব্যতিত সম্মূখ ও ভিতের চার পার্শ্বে মাঝখানে সাদা ও লাল রং এর চৌখুপি নকশা দেখা যায়। বারান্দার দেয়ালে জালি করা প্রত্যেকটি চৌখুপি প্যানেলের লাল বৃত্তাকার নকশা ও বৃত্তের মাঝা মাঝি একটি করে সাদা রং এর উলম্ব রেখা রয়েছে যা দিয়ে ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইমামবারার পবিত্রতা রক্ষার জন্য সিড়ির ওপরে মূল প্রবেশ পথে কাঠের রেলিং দেয়া আছে। পৃত্রিম পাশা ইমামবারার

[৪৮] এস.এম. ইলিয়াছ, ঐতিহাসিক কারবালা, ঢাকা: ২০০৩, পৃ, ১২১

সামনে ও পেছনের দিকে রয়েছে খোলা মাঠ যেখানে মহররমের সময়ে মিছিলকারীরা একত্রিত হন।

পৃত্রিম পাশায় মহররম পালন :

মহররমের চাঁদ দেখার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় জারী, মর্সিয়া, মজলিস ও মাতম। হবিগঞ্জের ইমামবারার মত এখানেও মহররমের নানা অনুষ্ঠান হয়। ৭, ৮ ও ৯ই মহররম রাত ১২টায় এই ইমামবারা থেকে মিছিল বের করা হয় এবং পরে মিছিলটি এখানে ফিরে এসে শেষ হয়। ১০ই মহররম আশুরার দিন সকালে আশপাশের গ্রাম থেকে ছোট ছোট অনেকগুলো মিছিল আসে এবং তারা একত্রে পৃত্রিম পাশা ইমামবারা থেকে একটি বিরাট মিছিল বের করে। এ মিছিলে প্রথমে থাকে পতাকাবাহী দল, পরপর পর্যায়ক্রমিকভাবে ঘন্টা বাদক দল, অশ্বারোহী দল, বেহেস্তের পতাকাবাহী ঝুলজানা, মাতম ও নোহার দল, কাসেদের দল, তাজিয়া বহনকারী দল, মর্সিয়ার দল, আলমবাহী দল, পঞ্চবাহী দল, মাতমকারীর দল, পাইকের দল ইত্যাদি সব মিলিয়ে ১০ থেকে ১৫ হাজার লোক এ মিছিলে অংশ গ্রহন করে থাকেন। বর্তমানে নওয়াব আলী সরওয়ার খান ও নওয়াব আলী ইয়াওয়ার খান মহররম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন[৪৯]।

৫.ঙ. মুড়ালী ইমামবারা, যশোর :

যশোর সদর উপজেলার রামনগর ইউনিয়নে প্রায় ৩০০ বছর পূর্বে হাজী মুহাম্মদ মুহসীন প্রতিষ্ঠা করেন মুড়ালী ইমামবারা। এটি যশোরের একটি ঐতিহ্যবাহী পুরাকীর্তি। উপনিবেশিক আমলে নির্মিত পাকা ইটের আয়তকার ইমারতটির উত্তর-দক্ষিণে ৬০ ফুট ও পূর্ব-পশ্চিমে ৫০ ফুট। ইমামবারার ভিতরের অংশ ১০ টি পিলার দ্বারা ৩ সারিতে বিভক্ত। খিলানগুলো কিছুটা খাঁজকাটা এবং নকশাযুক্ত। পলেস্তরার উপর ফুলের নকশা রয়েছে। সমতল ছাদযুক্ত ইমামবারার সামনের (ফ্যাসাদ) দিকে

[৪৯] নওয়াব আলী সরওয়ার খান (৫০)

৫টি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রয়েছে এবং ফ্যাসাদের সামনে চারধাপে সিড়ি রয়েছে। দরজার খিলানের টিমপ্যানামে (বন্ধ খিলান) পলেস্তরার উপর দেশজ লতাপাতার অলংকরণ রয়েছে। প্রতি পিলারের পলেস্তরার উপর দরজার উপরিভাগে কালো কালি দিয়ে আরবী লিপিতে আল্লাহ, হাসান, হোসেন লেখা সুন্দর ক্যালিওগ্রাফী রয়েছে।

ইমামবারার পার্শ্বে রয়েছে ছোট্ট একটি পুকুর যা স্থাপত্যটির সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। দেশের অন্যান্য ইমামবারা ন্যায় এখানেও আশুরা পালন হয়ে থাকে জাঁকজমকের সাথে। ১লা মহররম হতে ১০ই মহররম পর্যন্ত রাত্রি বেলায় মজলিসের আয়োজন হয়। প্রায় এক ঘন্টা মজলিস হওয়ার পর নওহা ও মাতম অনুষ্ঠিত হয়। নিয়মিত এই মজলিসে নওহা মাতমের অনুষ্ঠান চলতে থাকে এবং এই ১০ দিন ভক্তরা নেয়াজ বা শিরনি স্বরূপ মোমবাতি, আগরবাতি, গোলাপ জল, আতর, ফুল, ফুলের মালা, তোড়া, টাকা-পয়সা, মিষ্টি ও খাদ্য সমাগ্রী, মুরগী ও কবুতর ইত্যাদি ইমামবারায় দান করে থাকেন। ১০ই মহররম আশুরার দিন সকাল ১০ টায় মিছিল বের কিছু পথ প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসে কেন্দ্রে।

দক্ষিনাঞ্চলের শিয়া মুসলমানদের জন্য একটি অন্যতম পবিত্রস্থান ৩০০ বছরের পুরনো যশোরের মুড়ালী ইমামবারা।

৫.চ. অষ্টগ্রাম ইমামবারা, কিশোরগঞ্জ :

ভৌগলিক অবস্থানের দিক দিয়ে অষ্টগ্রম বৃহত্তর জেলা ময়মনসিংহের পূর্বাঞ্চল কিশোরগঞ্জ জেলার পূর্ব সীমায় অবস্থিত একটি সমৃদ্ধশালী ও ঐতিহাসিক জনপদ। পূর্বাঞ্চল সিলেট জেলার উত্তর সীমা, দক্ষিণে কুমিল্লা জেলার সীমানা আর পশ্চিম-উত্তওে যথাক্রমে ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনার হাওর অঞ্চল দ্বারা বেষ্টিত। উল্লেখিত ভৌগলিক সীমানা আবার মেঘনা, ধলেশ্বরী, ধেনু ও ঘোড়া উৎরা এ চারটি নদী দ্বারা বেষ্টিত। গ্রামটির সাথে অন্যান্য জনপদের যোগযোগের একমাত্র মাধ্যম জলপথ। নদী

আর নদী এবং হাওড়ের মাঝখানে ঘন বসতিপূর্ণ আটটি গ্রাম নিয়ে জনপদটি গঠিত হয়েছে বলেই সম্ভবত এর নামকরণ করা হয় অষ্টগ্রাম।

হযরত শাহজালাল (র:) এর প্রধান সহচর সিপাহসালার হযরত সৈয়দ নাছির উদ্দিন (র:) এর বংশধর হযরত সৈয়দ শাহ ছাবের (রা:) এর ঔরসে হযরত সৈয়দ শাহ্ আবদুল করিম আল হোসাইনী (রা:) উরফে সৈয়দ আলাই মিয়া ইংরেজী ১৮০৭ সালে হবিগঞ্জ জেলার ইতিহাস প্রসিদ্ধ সুলতানেশী হাবিলীর সৈয়দ পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। সৈয়দ আলাই মিয়া সিলেট শহরে লেখাপড়া করেন। জনশ্রুতি আছে যে, ছাত্রাবস্থা থেকেই তাঁর অলৌকিক গুণ ও কেরামতি প্রকাশ পেতে থাকে। জানা যায়, তিনি অন্যের আকৃতি ধারণ করে অবাধে বিচরণ করতে অভ্যস্থ ছিলেন। তিনি আরবী, ফার্সি ও উর্দু ভাষার সুপণ্ডিত ছিলেন। সিলেটে অধ্যায়ন শেষে তিনি কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রামের হাবিলীতে নানার বাড়ীতে চলে আসেন। অষ্টগ্রামের হাবিলীতে তখন ছিল তৎকালীন দেওয়ান সাহেবের বাসস্থান। তাদের বাসস্থানে অষ্টগ্রামের হাবিলী বাড়ী নামে বিখ্যাত হয়ে আছে। সে সময় মত-দ্বৈততার কারণে দেওয়ান পরিবারে আত্মকলহ দেখা দিলে ১৭৯২ খ্রিঃ জমিদারী দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক ভাগ আট আনা পৌনে পনের গণ্ডা অংশ পেয়ে দশ কোষা নামের হিস্যা নিয়ে জমিদারীর এক অংশ ইটনা উপজেলায় বসতি স্থাপন করে। সাত আনা সোয়া পাঁচ গণ্ডা অংশ নিয়ে নয় কোষা নামের হিস্যা নিয়ে অন্য অংশের ভাগিদার অষ্টগ্রামে থেকে যান[৫০]।

অষ্টগ্রামে থেকে যাওয়া জমিদারীর শেষ দিকের জমিদার ছিলেন চাঁন বিবি। চাঁন বিবির একমাত্র কন্যা জিন্নাত চাঁন বিবির সঙ্গে সৈয়দ আলাই মিয়ার পিতা হযরত সৈয়দ শাহ ছাবের (র:) এর সাথে বিবাহ হয়। জিন্নাত চাঁন বিবির গর্ভে সৈয়দ আলাই মিয়া ও তার দুই সহোদর সৈয়দ মলাই ও সৈয়দ জলাই মিয়ার জন্ম হয়। জমিদারীর মালিক চাঁন বিবির একমাত্র পুত্র দেওয়ান করম রেজা অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যু বরণ

[৫০] মারুফ মণ্ডল (৫৫) স্থানীয় ব্যক্তি

করেন। জমিদার চাঁন বিবির কোন পুত্র সন্তান না থাকায় তিনি তাঁর দৌহিত্র আলাই মিয়ার নিকট জমিদারী সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করেন। সৈয়দ আলাই মিয়া সিলেটে অধ্যায়ন শেষে অষ্টগ্রামে হাবিলীতে নানার বাড়ীতে চলে আসেন। জমিদারীর দায়িত্ব পাওয়ার পরও সৈয়দ আলাই মিয়া খোদা প্রেমে মশগুল ছিলেন, আধ্যাত্মিক জ্ঞান অন্বেষনে সদা নিমগ্ন থাকতেন। জমিদারীর প্রতি তাঁর আসক্তি খুব কম থাকায় জমিদারীর আয় উন্নতি ও রক্ষণাবেক্ষণে ছিলেন খুবই উদাসীন। অন্যমনস্কতার কারণে অনাদায়ী খাজনার দায়ে ১৮৩৬ খ্রিঃ জমিদারী নিলাম হয়ে যায়। জমিদারী নিলামের পর তিনি তার অবশিষ্ট সকল সম্পদ গরীব দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দেন এবং বাড়ীর অনতিদূরে একটি জীর্ণ কুটিরে আস্তানা করে বসবাস করতেন। আলাই মিয়ার দুই পুত্র ও এক কন্যা সন্তান ছিল। তিনি বাংলা ১৯০২ সালের ১ মে ইন্তেকাল করেন। অষ্টগ্রাম হাবিলী বাড়ীর আঙ্গীনায় সুদৃশ্য অট্টালিকার ভিতর তার মাজার শরীফ বিদ্যমান।

হযরত শাহ আব্দুল করিম আল হোসাইনি (র:) উরফে সৈয়দ আলাই মিয়া জীবদ্দশায় মহররম পালনের উদ্দেশ্যে ইংরেজী ১৮৪৩ সালে হাবিলী বাড়ী হোসেনী দালান প্রতিষ্ঠা করেন। অষ্টগ্রাম মৌজায় অবস্থিত ইটের তৈরী উক্ত হোসেনী দালানটির দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট, প্রস্থ ১০ ফুট ও উচ্চতা ৮ ফুট। ৪ ফুট বারান্দা সহ দালানটির ১টি দরজা ও ১টি জানালা রয়েছে। আলাই মিয়ার মৃত্যুর পর কয়েক বার দালানটি সংস্কার হয়।

অষ্টগ্রাম উপজেলা মোট ২১টি হোসেনী ঘর রয়েছে। প্রতি মহরমের ৯ ও ১০ তারিখে সকল হোসেনী ঘরের লোকজন হাবেলী বাড়ীতে এসে সমবেত হয় এবং গাস্ত, মিছিল ও ফাতেহা পাঠ করে থাকে। ১০ মহরম বিকাল ৪টায় তাজিয়াকে অনুসরণ করে স্থানীয় মধ্য অষ্টগ্রামে কারবালা নামক স্থানে গিয়ে মহরমের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়। দীর্ঘ ১৬৬ বছর ধরে এখানে মহরম পালিত হয়ে আসছে। সৈয়দ আলাই মিয়ার নিয়ম অনুসারে তার অনুসারীরা মহরম পালন কালীন ১০ দিন রোজা পালন, খালি

পায়ে থাকা, মাছ মাংস না খাওয়া, বিছানায় না থেকে মাটিতে থাকা ও সাধারণ কাপড় পরিধানের মাধ্যমে জারি, মার্সিয়া, তাজিয়া মিছিল, গাস্ত ও ফাতেহা পাঠ করে থাকেন।

পরবর্তীতে সৈয়দ আলাই মিয়ার অনুসারীরা কিশোরগঞ্জ জেলাধীন ভৈরব উপজেলা শম্ভুপুর ও জগন্নাথপুর, বাজিতপুর উপজেলার ভাগলপুর দেওয়ানবাড়ী, নেত্রকোনা জেলার খালিয়াজুরী ও মদন উপজেলা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার সরাইল উপজেলাধীন পাকশিমুল ও কালীশিমুল, নাসিরনগর উপজেলাধীন নাসিরপুর, চাতলপাড়, কুলকারকান্দি, বড়নগর, ফেদিয়ারকান্দি ও দূর্গাপুর এবং সুনামগঞ্জ জেলার বাদাঘাট এলাকায় মহররম পালন শুরু করেন[২১]।

৫.ছ. সুলতানশী ইমামবারা :

দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় হবিগঞ্জেও বেশ কিছু ইমামবারা রয়েছে। ঢাকার হোসেনী দালানের ন্যায় এখানেও বেশ জাকঁজমকের সাথে আশুরা পালন করা হয়। হবিগঞ্জে যে কয়টি ইমামবারা আছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি হল ১০ নম্বর লস্করপুর ইউনিয়নের সুলতানশীর ইমামবারা। যোখানে আরাকান রাজ সভার কবি সৈয়দ সুলতানের বাড়ি। এ পবিত্র ভূমিতেই অনেক কামেল-ওলি ও সুফি ঘুমিয়ে আছেন। সৈয়দ মোহাম্মদ আব্দুর রহিম আল হোসাইনী সুলতানশী ইমামবারার প্রতিষ্ঠাতা। পাকা ইটের তৈরী এক গম্বুজ বিশিষ্ট সুলতানশী ইমামবারা দেখলে মনে হয় মোঘল আমলে নির্মিত। সমতল ছাদযুক্ত সুলতানসী ইমামবারার প্রবেশ পথ একটি। এই ইমামবারায় কোন জানালা নেয়। মূল গম্বুজের উপরে ওল্টানো পদ্ম পাপড়ি দ্বারা আচ্ছাদিত। ছাদের চার কোনায় চারটি ছোট ছত্রী আছে। ইমামবারার তিন দিকে খিলানযুক্ত বারান্দা আছে। ইমামবারা চার দিকে পাকা ইটের দেয়াল দ্বারা ঘেরা। সুলতানশী ইমামবারার এককোনে একটি খেজুর গাছ রয়েছে।

---

[২১] এস.এম. ইলিয়াছ, ঐতিহাসিক কারবালা, ঢাকা: ২০০৩, পৃ, ১২২-২৫

বর্তমান পীর সৈয়দ হাসান ইমাম হোসাইনী চিশতীর বর্ণনায় প্রায় ১৫০ বছর পূর্ব থেকে সুলতানশীর ইমামবারায় মহররমের উৎসবাদি পালিত হয়ে আসছে। সুলতানশীর সাহেব বাড়ির ইমামবারায় প্রতি বছর মহাসমারোহে পবিত্র মহররমের উৎসবাদি পালিত হয়। দূর-দূরান্তের বিভিন্ন গ্রাম থেকে হাজার হাজার আহলে বাইয়াতের ভক্তরা আশুরার দিন সকালে সুলতানশীর ইমামবারায় এসে জড়ো হয় চৌদ্দশ' বছর পূর্বে সংঘঠিত কারাবালার যুদ্ধে শহীদদের স্মরণ করতে।

মহররমের চাঁদ দেখার পর থেকে এই ইমামবারাকে কেন্দ্র করে শুরু হয় আশুরা পালনের নানা আয়োজন। ১লা মহররম থেকে এখানে প্রতিদিন খুব সকালে ও রাতে মজলিসের ব্যবস্থা থাকে। ভক্তরা ধর্মীয় আলোচনা করেন যাতে প্রাধান্য পায় ইমাম হাসান (রঃ) ও ইমাম হোসেন (রঃ) এর কারবালার যুদ্ধে শহীদ হওয়ার বর্ণনা। ইমামবারার সামনে চলে শোক ও মাতমের জারি। এই গ্রামের প্রতিটি পরিবারেই তৈরী হয় মহররমের বিশেষ শিরনী। এ দশ দিন ভক্তরা নেয়াজ বা শিরনী স্বরূপ টাকা-পয়সা, মোমবাতি, আগরবাতি, গোলাপ জল, আতর, ফুল, মিষ্টি ও খাদ্য সমাগ্রী, গরু ছাগল, মুরগী, কবুতর ইত্যাদি ইমামবারায় দান করে থাকেন। ৮ই ও ৯ই মহররম সুলতানশী ইমামবারা থেকে মিছিল বের হয়।

১০ই মহররম আশুরার দিন সকালে সুলতানশী থেকে বিরাট মিছিল বের হয়। এ মিছিলে প্রথমে থাকে পতাকাবাহী দল, পরপর পর্যায়ক্রমিকভাবে ঘন্টা বাদক দল, অশ্বারোহী দল, বেহেস্তের পতাকাবাহী ঝুলজানা, মাতম ও নোহার দল, কাসেদের দল, তাজিয়া বহনকারী দল, মর্সিয়ার দল, আলমবাহী দল, পঞ্চবাহী দল, মাতমকারীর দল, পাইকের দল ইত্যাদি সব মিলিয়ে ৩ থেকে ৪ হাজার লোক এ মিছিলে অংশ গ্রহন করেন। বর্তমানে পীর সৈয়দ হাসান ইমাম হোসাইনী চিশতী ও সৈয়দ গোলম নবী হোসাইনী চিশতী এই মহররম অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

সুলতানশীতে পবিত্র মহররম অনুষ্ঠান ছাড়াও পীর কামেলদের স্মরণে বাৎসরিক ওরশ মোবারক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

৫.জ. চন্দ্রচুড়ী ইমামবারা :

হবিগঞ্জ সদর উপজেলার একটি গ্রামের নাম চন্দ্রচুড়ি। শাহ সৈয়দ ইদ্রিস আলী (র) চন্দ্রচুড়ী ইমামবারা প্রতিষ্ঠা করেন। কথিত আছে চন্দ্রচুড়ি সাহেব বাড়ীর কাছে রয়েছে অনেক পীর-ওলি ও দরবেশের মাজার। সাহেব বাড়ির এই মাজারকে ঘিরে গড়ে ওঠেছে একটি পবিত্র ইমামবারা যা চন্দ্রচুড়ী ইমামবারা নামে পরিচিত। চন্দ্রচুড়ী ইমামবারা পাঁকা ইটের তৈরী। এখানে দুটি আলাদা ইমারত। একটি পাক পাঞ্জাতনের জন্য অন্যটি মহররমে ব্যবহৃত জিনিসপত্র রাখার ঘর। পাক-পাঞ্জাতনের ঘরটি পাকা সমতল ছাদযুক্ত হলেও আকারে ছোট। ছাদের ওপরে চারকোনে চারটি কলস বসানো এবং মাঝে ছোট ছোট চারটি গম্বুজ আছে। প্রবেশ পথ একটি। কোন জানালা নেয়। পাক পাঞ্জাতনের প্রবেশ পথের দু'পার্শ্বে ফুলের নকশা করা আছে। এর চারদিকে পাকা ইটের অর্ধ দেয়াল দ্বারা বারান্দা করা আছে।

ইমামবারার জন্য নির্মিত অন্য ইমারতটিও পাকা এবং দুটি কক্ষ। একটি কক্ষে মহররমে ব্যবহৃত জিনিসপত্র রাখা আছে। অন্য কক্ষে রয়েছে চন্দ্রচুড়ী ইমামবারার প্রতিষ্ঠাতা শাহ সৈয়দ ইদ্রিস আলী (র:) এর মাজার। এই ইমামবারায়ও প্রবেশ পথ একটি তবে কোন জানালা নেয়। ছাদের ওপরে দেয়াল উঁচু করা আছে। ছাদে প্রতি পিলারের ওপরে ছোট ছোট মাটির কলস বসিয়ে সৌন্দর্য বাড়ানো হয়েছে।

সারা বছর তেমন একটা খোঁজ না থাকলেও ১লা মহররমেই প্রাণ ফিরে পেয়ে যেন জেগে ওঠে চন্দ্রচুড়ি ইমামবারা। সাহেব বাড়ীর এই ইমামবারাটি আকারে একেবারে ছোট হলেও আশুরা পালনে কোন কমতি নেই এখানে। আলোকসজ্জা থেকে শুরু করে নানা রংঙের কাগজ আর কাপড়ের কালো পতাকায় সৌন্দর্য বাড়িয়ে তোলে

ইমামবারার। ১লা মহররম থেকে এখানেও সকাল-সন্ধ্যায় ধর্মীয় আলোচনা হয়। ৮ই মহররম ও ৯ই মহররম বিকেলে ছোটাকারে মিছিল বের হয়। যা আবার ইমামবারায় ফিরে আসে। ১০ই মহররম আশুরার দিন চন্দ্রচুড়ি ইমামবারা থেকে নানা আয়োজনে একটি বিশাল মিছিল বের হয়[৫২]।

৫.ঝ. সদরাবাদ ইমামবারা :

হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ থানাধীন সদরাবাদ (পিটুয়া) গ্রামে রয়েছে প্রসিদ্ধ কামেল দরবেশ সদর উদ্দিন (রা:)-এর মাজার। মাজারে ভক্তের কাছ থেকে জানা যায় তিনি শাহাজালাল (রা:)-এর সঙ্গী ছিলেন। তার নামানুসারেই সদরাবাদ গ্রামের নামকরণ হয়। তবে তার প্রমানাদি বা নির্ভরযোগ্য উৎস নেই। আর এই মাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছে সদরাবাদ ইমামবারা। সদরাবাদ ইমামবারা পাকা ইটের তৈরী এক কক্ষবিশিষ্ট আলাদা দু'টি ঘর। একটি ছাদযুক্ত অন্যটি টিন দ্বারা আচ্ছাদিত। ছাদযুক্ত কক্ষের সামনের দিকে খিলানযুক্ত একটি প্রবেশ পথ ও দুটি ছোট জানালা আছে। পেছনে কোন জানালা নাই। দুই পার্শ্বে ছোটাকারে একটি করে জানালা আছে। ইমামবারার সামনে রয়েছে টিন আচ্ছাদিত বারান্দা ও চারটি বর্গাকৃতির পিলার।

অন্য ঘরটি পাকা হলেও ছাদের পরিবর্তে টিন দ্বারা আচ্ছাদিত। সামনের দিকে একটি প্রবেশ পথ। কোন জানালা না থাকলেও পূর্ব ও দক্ষিণে বারান্দা আছে। দু'টি ঘরের সামনে রয়েছে সবুজ ঘাস আচ্ছাদিত খোলা জায়গা।

হবিগঞ্জের অন্যান্য ইমামবারার মত প্রতি বছর মহররম মাসে এখানেও আশুরা পালন করা হয়। ধর্মীয় কারণে কারবালায় শহীদের স্মরনে বিশেষ করে মহররম মাসের প্রথম দশ দিন এখানে ভক্তের আনা-গোনায় মুখরিত হয়ে ওঠে সদরাবাদ ইমামবারা। সকাল-সন্ধ্যায় ধর্মীয় মজলিসের আয়োজন করা হয়। ১০ই মহররম

---

[৫২] সৈয়দ খালেদ বখ্‌ত নাজন (৬৫), হবিগঞ্জ মহররম উদযাপন কমিটির সভাপতি

আশুরার দিন সকালে তাজিয়া সহকারে মিছিল বের হয়। এ মিছিলে জারি, মার্সিয়া, মাতম সহকারে হাজার হাজার লোক অংশগ্রহন করে[৫৩]।

৫.ঞ. কুর্শী ইমামবারা :

হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ থানার কুর্শী গ্রামে অবস্থিত কুর্শী ইমামবারা। প্রায় একশত বছর পূর্বে ভারতের বর্ধমান থেকে সৈয়দ আব্দুল জলিল (রা:) নামক জনৈক ধর্ম প্রচারক এই অঞ্চলে আসেন ধর্ম প্রচারের জন্য। সম্ভবত সে সময়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এই ইমামবারা। প্রথম দিকে এখানে অস্থায়ীভাবে ইমামবারা তৈরী করলেও এখন এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বর্গাকৃতির এক কক্ষ বিশিষ্ট একটি পাকা ইমারত পাকা ইটের তৈরী সমতল ছাদযুক্ত এক কক্ষ বিশিষ্ঠ একটি ইমামবারা। সামনের দিকে রয়েছে খিলানযুক্ত একটি প্রবেশ পথ ও দুটি জানালা। ইমামবারার ছাদে কোন গম্বুজ না থাকলেও চার কোনের পিলারগুলো অনেক মোটা। ইমামবারার বাইরে তিনদিকে বর্ধিতাকারে প্লাস্টার করা আছে। ইমামবারার পেছনের রয়েছে প্রতিষ্ঠাতার মাজার। এখানেও হবিগঞ্জ তথা বাংলাদেশের অন্যান্য ইমামবারার মত কুর্শী ইমামবারায় আশুরা পালন করা হয়। ১লা মহররম থেকে ১০ই মহররম পর্যন্ত করাবালার শোক উদযাপন হয়ে থাকে। ১লা মহররম থেকেই কুর্শী ইমামবারায় পালা করে ধর্মীয় আলোচনা চলে। ৮ই মহররম থেকে আশপাশের গ্রামের ভক্তরা এখানে আসতে শুরু করে। ১০ই মহররম অর্থাৎ আশুরার দিন কুর্শী ইমামবারার সামনে এক হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখা যায়। আশুরার দিন সকালে কুর্শী ইমামবারা থেকে বের হয় বিরাট এক মিছিল। এ মিছিলে অংশ নেয় পতাকাবাহী দল, ঘন্টা বাদকের দল, বেহেস্তের পতাকাবাহী ঝুলজানার দল, মাতম ও নোহার দল, কাসেদের দল, তাজিয়া বহনকারী দল, মর্সিয়ার দল, আলমবাহী দল, মাতমকারী ইত্যাদির দল। মিছিলে কেউ মাতম করছে 'হায় হাসান', 'হায় হোসেন' বলে, কেউ ছুরি দিয়ে নিজের শরীরে আঘাত ,করে। অন্যদিকে ইমামবারার মাঠে চলে রান্নার কাজ। আশ-পাশের গ্রাম থেকে আসা হাজার হাজার

[৫৩] এস.এম. ইলিয়াছ, ঐতিহাসিক কারবালা, ঢাকা: ২০০৩, পৃ, ১৩১

মানুষ তাদের মানতসহ ভক্তের দেয়া টাকায় প্রায় ৪০টি গরু জবাই করে ভক্তদের জন্য শিরনী স্বরূপ খাবারের আয়োজন করা হয়[৫৪]।

৫.ট. মুড়ারবন্দ ইমামবারা :

হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট এক প্রত্যন্ত গ্রাম। সেখানে অসংখ্য জামগাছের ছায়া ঘেরা স্থানে রয়েছে ইসলামের ঝাণ্ডাবাহি হযরত শাহজালাল (রা:) এর সিপাহসালা সৈয়দ নাসির উদ্দিন (রা:) এর মাজার ও ইবাদত খানা। স্থানীয়ভাবে কথিত আছে যে এ অঞ্চলে তাঁর পদার্পণ না ঘটলে হবিগঞ্জ তথা সিলেটের ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা হতো। তারই জন্য আজ সিলেটবাসী গর্ব ভরে নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করতে পারছে। এখন যে মাজারকে কেন্দ্র করে শতবছর ধরে পালিত হয়ে আসছে মহররম ও আশুরার অনুষ্ঠান। কথিত আছে মুড়ারবন্দে প্রায় ১২০ জন সঙ্গীসহ শুয়ে আছেন এই অমর মুসলিম বীর। মুড়ারবন্দ মাজারে বছরের প্রতিদিনই বিভিন্নস্থান থেকে বহু লোক এখানে মাজার জিয়ারত ও মানত করতে আসেন। ঠিক কবে থেকে মুড়ারবন্দের এই মাজার ইমামবারায় রুপ নেয়ার কোন ইতিহাস জানা যায় না। তার পরও স্থানীয় কয়েকজনের সাথে কথা বলে জানা যায় কয়েকশত বছর ধরে এখানে মহররমের অনুষ্ঠান পালিত হয়ে আসছে। হবিগঞ্জের অন্যান্য স্থানের ন্যায় মুড়ারবন্দ ইমামবারায়ও আশুরা পালন করা হয় জাকঁজমকের সঙ্গে। এমনিতেই মুড়ারবন্দ মাজারের ভক্তের সংখ্য অনেক তার পর আবার এই মাজারকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ইমামবারার আশুরা পালন। ১০ই মহররম আশুরার দিন সকালে বের হয় বিশাল মিছিল বা ইমাম ভক্তদের আহাজারী। এ মিছিলেও অংশ নেয় পতাকাবাহী দল, ঘন্টা বাদকের দল, বেহেস্তের পতাকাবাহী ঝুলজানার দল থেকে শুরু করে সব ধরনের মাতম ও কাসেদের দল, তাজিয়া বহনকারী দল, মর্সিয়ার দল, আলমবাহীর দল।

[৫৪] হারুন মেম্বর (৪৫), কুশী ইমামবারার উত্তরাধিকারী

৫.ঠ. সুরাবই ইমামবারা :

হবিগঞ্জ সদর উপজেলার সুরাবই সাহেব বাড়িতে অবস্থিত প্রসিদ্ধ সুরাবই ইমামবারা সুরাবই ইমামবারা পাকা ইটের তৈরী। সাহেব বাড়ী বাগানের মাঝে কোন রকমে দাঁড়িয়ে আছে এই ইমামবারাটি। প্রায় শত বছর ধরে পালিত হয়ে আসছে মহররমের নানা অনুষ্ঠান। আরবি মহররম মাসের প্রথম রাতেই ইমামবারায় আলোকসজ্জা করা হয় সাথে সাথে কালো নিশান উঠানো হয়। ১লা মহররম হতেই প্রতিদিন সন্ধ্যায় ইমামবারায় মজলিস শেষে ভক্তদের মাঝে শিরনি বিতরণ করা হয়। হবিগঞ্জের ইমামবারাগুলোর মধ্যে এটিতেই শুধু সাহেব বাড়ীর ভিতরে মহিলাদের জন্য এবং ইমামবারাতে পুরুষের জন্য একই সময়ে আলাদা মজলিসের ব্যবস্থা থাকে। সাহেব বাড়ীর ইমামবারায় ধর্মীয় মার্সিয়া অনুষ্ঠানে পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে পুরুষ-মহিলারা এসে যোগদান করেন।

৫ই মহররম রাতে অন্যান্য পারিবারিক ইমামবারা থেকে লোকজন মিছিল সহকারে সুরাবই সাহেব বাড়ি ইমামবারাতে আসে। এই ইমামবারাতে সারা রাত মজলিস, জারি, মার্সিয়া, মাতম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। একই ভাবে এরূপ অনুষ্ঠান মহররমের ৮ তারিখ পর্যন্ত চলে।

৯ই মহররম সকাল হতে চাঁনপুর, শ্রীরামপুর, মদনপুর, আলগাপুর, নোয়াগাঁও, নূরপুর, নসরতপুর বারলাড়িয়া, শৈলজোড়া, অলিপুর, পুরাসুন্দা, লাদিয়া, রিচি ফতেপুর এ সকল ইমাম বাড়া থেকে মিছিল সহকারে সাহেববাড়ী ইমামবারাতে এসে জারি, মার্সিয়া মাতম করে পুনারয় যার যার ইমামবারাতে ফিরে যান।

৯ই মহররম দিবাগত রাতে সুরাবই ইমামবারায় সবচেয়ে বড় মজলিশের আয়োজন করা হয়। ১০ই মহররম আশুরার দিন বিভিন্ন গ্রাম হতে শোক মিছিল সহকারে লোকজন জড়ো হয় এবং মাতম করে। ১০ই মহররমের মিছিলটি কয়েকগ্রাম

প্রদক্ষিণ করে আবার সাহেব বাড়ী ইমামবারায় ফিরে আসে। সন্ধ্যায় জারি, মার্সিয়া, মাতমের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। আশুরার শোকে বিহ্বল মানুষ তখন শোক মাতম আর যুদ্ধের বাজনায় বিভোর হয়ে হারিয়ে যায় সেই কারবালার প্রান্তরের নৃশংস হত্যা কাণ্ডের স্মৃতির মধ্যে।

মাগরিবের আজানের সাথে সাথে এ সকল শোক মিছিল পুনরায় নিজ নিজ ইমামবারায় ফিরে যায়। মহররমের নানা অনুষ্ঠান ১লা মহররম থেকে ১০ই মহরম পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়, অনুষ্ঠান পরিচালনার প্রধান কাজটি করে থাকেন সুরাবই সাহেব বাড়ি দরবার শরীফের পীর হযরত সৈয়দ শাহ করার (র:) ও খাদেম সৈয়দ ইনছারুল হক বুলবুল।

৫.ড. চট্টগ্রাম ইমামবারা, চট্টগ্রাম :

দূর থেকে এটিকে সাধারণ মসজিদ বলেই মনে হয়। বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্যও নেই সাদা রংয়ের দোতলা এ ইমারতটির। এ কারণে হয়তো অন্যকিছু ভাবার কোন সুযোগও নেই। এলাকাবাসীর আগ্রহও খুব একটা দেখা যায় না এটিকে ঘিরে। তবে একটু খোঁজ খবর নিলে জানা যাবে এটির ভিন্নতার বিষয়-আশয়। চট্টগ্রামের সদরঘাট রোডে অবস্থিত এ ভবনটি মসজিদের চেয়েও শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্থান হিসেবে অধিক পরিচিত।

নগরীর নিউমার্কেট মোড় থেকে সদরঘাট রোড ধরে কিছুদূর গেলে চোখে পড়বে শাহজাহান হোটেল। এর পিছনের গলিতে অবস্থিত সাদা রংয়ের সাদামাটা এ দোতলা স্থাপত্যটি। ইমামবারাটি আবার শিয়াদের মসজিদ হিসেবেও পরিচিত। নগরীর শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন এখানে নিয়মিত জড়ো হন। নিয়মিত নামাজের জামাত ছাড়াও এ সম্প্রদায়ের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও রীতিনীতি এখানে পালিত হয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পূর্বে পাকিস্তান আমলে ৫০ দশকে হেমায়েতুল মমিনুল ট্রাস্ট কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন সদরঘাটের এই 'ইমামবারা'। ২০ কাঠা জায়গা কিনে নিয়ে এখানে ইমামবারা প্রতিষ্ঠা করা হয়[৫৫]। সে সময়ে বসবাসরত শিয়া সম্প্রদায়ের লোকজন নিজেদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদযাপনের জন্য এ ইমামবারাটি প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে মীর্জা আহমদ ইস্পাহানী প্রতিষ্ঠিত হোসাইনীয়া ট্রাস্ট এ মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করছে।

আয়তাকার দ্বিতল ইমামবারার নিচ তলায় পুরুষদের নামাজ আদায়ের স্থান। একসাথে পাঁচ শতাধিক ব্যক্তি জামাতে নামাজ আদায় করতে পারে। সমসংখ্যক মহিলাদের দোতলায় নামাজের ব্যবস্থা রয়েছে। একমাত্র প্রবেশ পথের সামনে বেশ কয়েক কাঠা জায়গা ফাঁকা আছে। পুরো জায়গাটি দেয়াল দিয়ে ঘেরা।

ইমামবারা ইমামের বসবাসের জন্য নির্মিত হলেও বাংলাদেশের কোন ইমামবারায় ইমাম বসবাস করেন না। তাঁর জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা থাকে। একজন তত্ত্বাবধায়ক নিচ তলার একটি রুমে থেকে এটি তত্ত্বাবধান করেন। আর দুই ইমাম মাওলানা আমজাদ হোসেন এবং মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ রেজা রিজভী পালাক্রমে এখানে জামায়াতে ইমামতি করে থাকেন।

অন্যান্য মসজিদের মতো এখানে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্তে জামাত হয় না। তবে প্রতি শুক্রবার জুম্মার জামাত নিয়মিত হয়। প্রায় অর্ধশত ব্যক্তি নামাজ আদায় করতে এ মসজিদে আসেন। নামাজ আদায়ে শিয়া সম্প্রদায়ের আলাদা রীতির কারণে অন্যসব সাধারণ মসজিদে তারা জামাতে নামাজ আদায় করতে যান না। এ কারণে শিয়াদের আলাদা এ মসজিদ তথা ইমামবারার প্রতিষ্ঠা।

---

[৫৫] মাওলানা আমজাদ হোসেন, (৫০) চট্টগ্রাম ইমামবারার প্রধান ইমাম

দেশের অন্যান্য অংশের মতো চট্টগ্রামেও শিয়াদের সংখ্যা হাতে গোনামাত্র। নগরীর বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে একশত পরিবার বসবাস করে। বৃটিশ আমল থেকে চট্টগ্রামে শিয়াদের বসবাস। আগে সংখ্যায় বেশি থাকলেও দেশ ভাগের পর অনেকে ভারতে চলে যান। গোষ্ঠীগতভাবে তারা এক জায়গায় থাকেনি। ছড়িয়ে ছিটিয়ে অন্যান্যদের সাথে নগরীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাস করছে। হালিশহর, আমবাগান, সেগুন বাগান, ঝাউতলা, সার্জেন্ট রোড প্রভৃতি এলাকায় শিয়ারা বসবাস করে। পাকিস্তানি উর্দুভাষী বিহারীদের সাথে তাদের অনেকে এক করে দেখে থাকেন। তবে এটি ভুল ধারণা মাত্র বলে জানান তাদের ইমাম মাওলানা আমজাদ।

সদরঘাট রোডের এটি ছাড়াও নগরীর হালিশহর আবাসিক এলাকায় বি ব্লকের দুই নম্বর সড়কে আরও একটি 'ইমামবারা' আছে। পাকিস্তান আমলে মাওলানা আমজাদ হোসেনের চাচা ইমাম মাওলানা আক্তার হোসাইন হালিশর ইমামবারাটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনতলা বিশিষ্ট এই ইমারতরে প্রথম ও দ্বিতীয়তলা ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য নিদিষ্ট এবং তৃতীয় তলায় বসবাস করেন ইমাম মাওলানা আমজাদ হোসেন।

মহররম শোকের মাস। এ মাসে কোনভাবে খুশি হয়ে উৎসব পালনের সুযোগ নেই। লোক দেখানো মাতম করার বিরুদ্ধে শিয়া সম্প্রদায়। দোয়াদরূদ পালনের মধ্যে তারা তাদের কর্মকাণ্ড সীমিত রাখেন।

এই ইমামবারাতে প্রতি শুক্রবার সকালে ইমাম মেহেদীর আগমন কামনা করে শিয়া সম্প্রদায়ের মুসল্লীরা দোয়া করে থাকেন। এছাড়া প্রতি বৃহস্পতিবার রাতে বিশেষ দোয়া করা হয় এবং শিয়া সম্প্রদায়ের ১২ ইমামের জন্ম গ্রহণ এবং ওফাত বা মৃত্যু বার্ষিকীতে চাঁদের হিসাব করে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার-উৎসবের মধ্যদিয়ে দোয়া-মাহফিল এবং ওয়াজ নসিহতের আয়োজন করা হয়। সপ্তাহের অধিকাংশ সময় এই ইমামবারার চত্ত্বর নিরব থাকলেও ধর্মীয় দিনগুলোতে ইমামবারা দু'টি পরিণত হয় শিয়া সম্প্রদায়ের মিলন মেলায় এবং তাদের কোলাহলে হয়ে ওঠে মুখরিত।

পঞ্চম অধ্যায়

উপসংহার :

বাংলাদেশের নানা স্থানে মহররমের নানা অনুষ্ঠান পালন করা হলেও রাজধানী ঢাকা মহররম পালনের প্রধান কেন্দ্র। বাংলা অঞ্চলে এই রাজধানীকে ঘিরেই প্রথম মহররম পালন শুরু হয়েছিল। ঢাকার নবাব পরিবার শহরের অন্যান্য ঐশ্বর্যশালী মুসলমান পরিবারগুলোর সহযোগিতায় ঢাকার মুসলমানদের সামাজিক এবং ধর্মোৎসব বা পালা-পার্বণের সময় আর্থিক অনুদান দিতেন[৫৬]। কারণ একসময় ঢাকা ছিল মোঘল আমলে নায়েব নাজিমদের বাসস্থান। 'ঢাকার জীবন পদ্ধতি ও সংস্কৃতি মূলত আগ্রারই জীবন পদ্ধতি ও সংস্কৃতি। তার উপর ইরাক ও ইরানীদের আংশিক ও সজীব সংস্কৃতির অনেকটা প্রভাব বিস্তার করেছে'[৫৭]।

যদিও মহররম শোকের মাস এবং মহররম মানেই আমাদের মনে হয় বিষাদ, তবুও বাংলাদেশে তা রূপান্তরিত হয়েছে নানা ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা ও আচার-উৎসবে। মহররম শিয়া সম্প্রদায়ের ধর্মীয় উৎসব হলেও সব সম্প্রদায়ের লোকজনই এতে অংশগ্রহণ করেন। শিয়ারা ধর্মীয় কারণে এবং অন্যেরা মহররমের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির কারনে এত অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, এখানে শিয়া সম্প্রদায়সহ সুন্নী ও অপরাপর ধর্মালম্বীরাও নানা ধর্মীয় আচার ও মানতে অংশগ্রহন করেন।

মহররমের বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন করতে বাংলাদেশের বিভিন্নস্থানে গড়ে ওঠেছে এসব ইমামবারা। আমার এই অভিসন্দর্ভে বাংলাদেশে বিদ্যমান ইমামবারা সম্পর্কে আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ঢাকাসহ দেশের প্রায় সব ইমামবারা পাকা ইট দ্বারা নির্মিত। এদেশে নির্মিত ইমামবারাগুলোতে কোন সুনির্দিষ্ট রীতি বা নির্মাণশৈলী দেখা যায় না। কোন ইমামবারা আয়তাকার আবার কোনটা বর্গাকৃতির।

---

[৫৬] সুফিয়া আহমেদ, *ঢাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঢাকার নবাব পরিবারের ভূমিকা* (অন্তর্ভুক্ত) ইফতিখার-উল-আওয়াল (সম্পা) ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী: বিবর্তন ও সম্ভাবনা, খণ্ড-৫, ঢাকা: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৩, পৃ, ৩৭

[৫৭] মুনতাসির মামুন, ঢাকা সমগ্র, খন্ড - ১, ঢাকা: অনন্যা, ২০০৩- ২০০৬, পৃ, ১৯২

প্রতিটি ইমামবারা আলাদা আলাদা রীতিতে নির্মিত হয়েছে। প্রাচীন ইমামবারা গুলোতে মোঘল ও ঔপনিবেশিক আমলের শৈলী দেখা যায়। যেমন: হোসেনী দালান ইমামবারা। কিছু ইমামবারা বাংলো স্টাইলে উপনিবেশিক শৈলীতে নির্মিত। যেমন: পৃত্রিম পাশা ইমামবারা। আবার কিছু ইমামবারা রয়েছে যা একেবারেই দেশজ স্টাইলে বা দোচালা-চৌচালা ঘরের মত নির্মিত। এর কারণ ছিল অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা।

তবে, এদেশের সবগুলো ইমামবারার একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তা হল বাংলাদেশে নির্মিত প্রায় সব ইমামবারার অভ্যন্তরে স্থান পেয়েছে প্রতিষ্ঠাতার মাজার। সব ইমামবারাতেই সংরক্ষিত থাকে মহররমের মিছিলে ব্যবহৃত জিনিসপত্র যেমন: তাজিয়া, পতাকা, আলম বা ঢাল-তলোয়ার, জারিখানা বা শিয়া ইমামের প্রতিকী মাজার ইত্যাদি।

পাক-পাঞ্জাতনগুলো আকারে খুব ছোট কিন্তু এর গুরুত্ব অনেক বেশি। তবে হোসেনী দালান ব্যতিত অন্যান্য সব ইমামবারায় একটি করে পাক-পাঞ্জাতনের (পাঁচ আত্মার নাম) জন্য নির্মিত হয়েছে আলাদা ইমারত। এই পাক-পাঞ্জাতনের ভিতরে পাঁচ আত্মা যথাক্রমে হযরত মুহাম্মদ (সা:), হযরত আলী (রা:), হযরত ফাতেমা (রা:), ইমাম হাসান (রা:) ও ইমাম হোসেন (রা:) এর নাম লেখা আছে।

মানিকগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সিলেটে নির্মিত ইমামবারাগুলো কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে মসজিদ ও মাজারসহ অন্যান্য ইমারত। তবে, এসব ইমামবারাগুলোতে তেমন জৌলুস না থাকলেও ইমামদের বসবাসের জন্য নির্মিত ঘর-বাড়ী খুব জাঁকজমকের সঙ্গেই নির্মাণ করা হয়েছে। সেই তুলনায় মূল ইমামবারা সমূহের স্থাপনা ততটা গুরুত্ব সহকারে নির্মাণ করা হয়নি। উল্লেখ্য, ঐসব ইমামবারা স্থান পেয়েছে টিনের চৌচালা। এর অলংকরনে ব্যবহৃত হয়েছে দেশজ লতা-পাতার নকশা। সব ইমামবারার সামনেই রয়েছে ভক্তদের সমবেত হওয়ার জন্য খালি জায়গা। প্রতিটির পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে একটি করে সুদৃশ্য মসজিদ।

ইমামবারাগুলোতে গড়ে ওঠেছে এক বা একাধিক মাজার। মহররম মাস ছাড়া বছরের সারা সময়ই চোখে পড়ে ইমামবারাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা মাজার আর ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেনের প্রতীকী মাজার জিয়ারত। সিলেট ও হবিগঞ্জ অঞ্চলের ইমামবারায় প্রাধান্য পেয়েছে ইমামবারার প্রতিষ্ঠাতার মাজার। বাংলাদেশে মাজারের প্রতি মুসলমানদের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় সুফী দরবেশদের কবর জিয়ারত থেকে[৫৮]। ইমামবারায় সমাধিস্থ ব্যক্তির ওরস অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী পালন হয়। যদিও ইসলামে মাজারকে (কবর) মসজিদে পরিণত করা অর্থাৎ সিজদাহ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ [৫৯]।

বাংলাদেশে মহররম মুসলিম সমাজে একটি শোকাকূল ও ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ দিন। ইমাম হোসেনের শহীদ হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনা ও আরো অনেক ইসলামী বিষয়ের জন্য মহররম মাস মুসলমানদের নিকট অতি পবিত্র[৬০]। মহররম মাসের প্রথম দিন থেকেই বাংলাদেশের শিয়া মুসলমানেরা রোজা রাখেন, মিলাদ পড়েন, মৃত ব্যক্তির কবর জিয়ারত করেন এবং ইমামবারায় মজলিসের আয়োজন করেন। এদেশের লোকসমাজে মহররমের ঐতিহাসিক গুরুত্বের চেয়ে লোকায়ত আচার-বিশ্বাস ও সংস্কার বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। যেমন: সাধারণত পরিবারের সদস্যদের রোগমুক্তি ও মামলা মোকদ্দমায় জয়ী হওয়ার জন্য মানত করা হয়। এমনকি পুত্র-কন্যার বিবাহের ব্যাপারে ইমামবারার প্রতিকী মাজারে তালাবদ্ধ করার রীতিও আছে বাংলাদেশে। মানতকারীগণ বিশ্বাস করেন যে, এইসব মাজারে (ইমামবারায় ইমামমের প্রতীকী মাজারে) তালাবদ্ধ করলে অনিষ্টকারীরা তাদের ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

---

[৫৮] সিরাজুল, ইসলাম (সম্পা), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-৮, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ, ১০৩

[৫৯] সিরাজুল, ইসলাম (সম্পা), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-৮, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ, ১০৩

[৬০] ওয়াকিল আহমদ লোকসংস্কৃতি, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৭, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭,পৃ, ৩৩১

বাংলাদেশে বসবাসরত শিয়া মুসলমানরা মহররম মাসে সাধারণত খাবারের ব্যাপারে বেশ সচেতন থাকেন। যেমন: আমিষ (মাছ-মাংশ) জাতীয় খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকেন। এসময় তাঁরা সাধারণত নিরামিষ ভক্ষণ করেন।

মহররম মাসে শিয়া মতাবলম্বীরা তাদের পুত্র-কন্যার বিবাহ দেন না। এমনকি এই মাসে কোন সন্তানের জন্ম হলে তার জন্মদিন অনুষ্ঠানও পালন করা হয় না। আবার এই মাসে কেউ মারা গেলে, তার মৃত্যুবার্ষিকীও তাঁরা পালন করেন না। তবে মহররম মাসে নিষ্ঠার সাথে তারা রোজা রাখেন, নামাজ পড়েন এবং মানত করেন।

ঢাকা এবং ঢাকার বাইরে শিয়ারা মহররম মাসে শোকের পোশাক পরেন। কালো রং তাদের কাছে মহররম মাসের শোকের প্রতীক। তাই এই মাসে কালো রঙের পোশাক পরার চেষ্টা সব শিয়ারাই করে থাকেন। এছাড়া পুরনো কাপড় পরিধান করেন। মহররম মাসে তারা খুব চকচকে রং অথবা নতুন পোশাক পরা থেকে বিরত থাকেন।

পরিশিষ্ট

ঢাকার পারিবারিক ইমামবারা :

১. ইমামবারা বিবি জাহুরান : (১৩ নং বকশী বাজার লেন, ঢাকা) ১লা মহররম থেকে ৯ই মহররম সকালে ও রাতে এখানে মাজলিস হয়। বয়ান করেন হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হাশেম আব্বাস, ব্যবস্থাপনায়ঃ সৈয়দ মোহাম্মদ আজম, মোতাওয়ালি, সুলতান নেসা খানম ওয়াক্ফ ষ্টেট

২. ২৭নং হোসেনী দালান রোড, ঢাকা (সৈয়দ আহম্মদ রেজা বাবু) : ১লা মহররম থেকে ১২ই মহররম পর্যন্ত পুরুষদের জন্য বয়ান করেন হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা সৈয়দ রাযা হোসাইনী সাহেব। মহিলাদেও জন্য সন্ধ্যায় বয়ান করেন হজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা সৈয়দ রাশেদ হুসাইন জায়দী সাহেব

৩. ইমামবারা মীর ইয়াকুব ওয়াক্ফ : ১নং হোসাইনী দালান রোড, ঢাকা। ১লা থেকে ৯ই মহররম পর্যন্ত সকালে মজলিসের ব্যবস্থা থাকে। ব্যবস্থাপনায়: শিয়া আঞ্জুমানে হোসাইনী

৪. মারহুম মির্জা আব্বাস ইমামবারা : তাত খানা লেন, ঢাকা। পুরুষ মজলিস সকাল ১০ টায়

৫. শিরাজী হাউস, ইমামবারা : ৫/১, গোলাম মোস্তফা লেন, ১লা থেকে ৯ই মহররম পুরুষদের মজলিস সকালে ও মহিলাদের মজলিস বিকেলে হয়

৬. মোসাম্মৎ মোহাম্মদী বেগম সাহেবা ওয়াক্ফ ইমামবারা : ৪৮, হাবুল হাসনাত রোড, (সাতরওজা), ঢাকা। মোতাওয়াল্লী সৈয়দ তাকি মোহাম্মদ (বুড্ডান সাহেব), ১লা থেকে ৯ই মহররম পর্যন্ত পুরুষদের মজলিস হয় আর সন্ধ্যায় মহিলাদের মজলিসের ব্যবস্থা থাকে। বয়ান করেন সৈয়দ রাশেদ হোসাইন জায়দী সাহেব, হোসেনী দালান ইমামবারার বর্তমান প্রধান ইমাম

৭. ২৪/৪, বড় কাটরা ওয়াক্‌ফ ইমামবারা : মোতাওয়াল্লী মির্জা মোঃ আকিল ও ডাঃ মির্জা নাজিমুদ্দিন, মাজলিস ১লা থেকে ৯ই মহররম

৮. বেচারাম দেউড়ী ইমামবারা : ২৮/১, আলী হোসেন খান রোড, ঢাকা। মীর এনায়েত আলী মুতাওয়াল্লী বিলকিস খানম ওয়াক্‌ফ ষ্টেট। মাজলিস হয় ১লা হইতে ৯ ই মহররম পর্যন্ত

৯. বিবিকা রওজা আশেকান কমিটি : (ফরাশগঞ্জ) পুরুষ মাজলিসঃ এখানে ১লা থেকে ১২ই মহররম পর্যন্ত মজলিস হয়

১০. মরহুম মির্জা কাযেম সাহেব ইমামবারা : ৪৮, আলী নাকী দেউড়ী, ঢাকা। ১লা মহররম থেকে ৯ই মহররম সকাল ও সন্ধ্যায় মজলিস হয়

১১. হোসাইন মাঞ্জিল (আখতার হোসাইন) ইমামবারা : ৯/এইচ, হোসেনী দালান রোড, ঢাকা। মাজলিস হয় ১লা মহররম থেকে ৯ই মহররম পর্যন্ত

১২. মরহুম মোবারাক হোসাইন জুম্মান সাহেব ইমামবারা : ৩৪, হোসেনী দালান রোড, ঢাকা। মাজলিস ৮ই মহররম সকাল ১০.৩০ মিনিটে বয়ান করেন হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা সৈয়দ নাকী ইমাম রিজভী

১৩. মোঃ খুরশীদ আলম ইমামবারা : ৮০, হোসেনী দালান রোড, ঢাকা। মাজলিস হয় ৮ই মহররম সকালে; বয়ান করেন হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা হাশেম আব্বাস সাহেব

১৪. ইমামবারা শিরিন বেগম : ৪৬, আলী নাকী দেউড়ী। মাজলিস হয় ১লা থেকে ১২ই মহররম সন্ধ্যায় (শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য)

১৫. মরহুম মির শাহজাদা মিয়া ইমামবারা : বাংলাদেশ মাঠ, আব্দুল হাদী লেন, ৬ই মহররম মাজলিস হয় (শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য) বয়ান বেগম নাকী ইমাম

১৬. মোমেনা খাতুন ইমামবারা : ৪০/২, আসগার লেন, (চুরিহাট্টা), ঢাকা। ১লা থেকে ৭ই মহররম সন্ধ্যায় মজলিস হয়। বয়ান করেন জনাব নিয়ামত মোস্তফা ও হুজ্জাতুল ইসলাম মাওলানা সৈয়দ নাকী ইমাম রিজভী

১৭. হোসায়নী ইমামবারা : ৯নং তাত খানা লেন, ঢাকা। পুরুষদের মজলিস হয় ৩ থেকে ৯ই মহররম। এবং মহিলাদের জন্য ৫, ৭ ও ৯ই মহররম মজলিস হয়। বয়ান করেন সৈয়দা নিঘাত ফাতিমা

১৮. মহিলা মাদ্রাসা ইমাবারা : ১৯/১, হোসেনী দালান রোড, ঢাকা। মহিলাদের মজলিস হয় ১লা মহররম থেকে ৯ই মহররম পর্যন্ত

১৯. মরহুম সুবা সাহেব হাউজ ইমামবারা : ১৯/১, হোসেনী দালান রোড, পুরুষদের মাজলিস হয় ১লা মহররম হইতে ৯ই মহররম পর্যন্ত । হোসেনী দালান ইমামবারার মজলিসের পর বয়ান করেন মাওলানা সৈয়দ হাবিব রেজা হোসাইনী

২০. বেগম আমরুন নেসা ইমামবারা : ১১১, আবুল হাসনাত রোড, ঢাকা। এখানে মাজলিস হয় ১লা মহররম থেকে ১২ই মহররম পর্যন্ত। এখানে মহিলাদের মজলিসের আয়োজন থাকে ৭ই মহররমের দিন।

বাংলাদেশে বিলুপ্ত প্রায় ইমামবারা :

এই সব ইমামবারাগুলোর নাম গ্রন্থ ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় পাওয়া গেলেও এগুলোর কোন স্থাপনা বা ইমারত এখন আর দেখা যায় না। উল্লেখ্য যে, মহররম মাসের নানা অনুষ্ঠানাদি এই স্থানগুলোতে পালিত হয় যথা:

১. কাসার-ই-হুসাইনি ইমামবারা, খুলনা
২. খালিশপুর মসজিদ ইমামবারা, খুলনা
৩. পারুলিয়া মসজিদ ইমামবারা, সাতক্ষিরা
৪. দেবহাটা ইমামবারা, সাতক্ষিরা
৫. নূরনগর ইমামবারা, সাতক্ষিরা
৬. গোয়ালন্দ ইমামবারা, রাজবাড়ী
৭. কুমিল্লা ইমামবারা
৮. ময়মনসিংহ ইমামবারা ।

শব্দকোষ

ইমামবারা :	আক্ষরিক অর্থে ইমামের বাসভবন। যেখানে ইমাম হাসান (রা:) ও ইমাম হোসেন (রা:) এর উদ্দেশ্যে শোকসভা ও ইমামের জন্মবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে হোসেনী দালান ইমামবারায় ইমামের জন্মবার্ষিকী পালনের অনুষ্ঠান করা হয় না
ইমাম :	ধর্মীয় নেতা। শিয়া সম্প্রদায়ের আধ্যাত্মিক ইমাম। [হযরত আলী (রা:) থেকে বার ইমাম অর্থাৎ ইমাম মাহ্দী পর্যন্ত]
মজলিস :	ধর্মীয় আলোচনা; বিশেষ করে কারবালার ঘটনা। জন্মবার্ষিকীতে প্রথমে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা:) কে কেন্দ্র করে এবং পরে যে ইমামের জন্মবার্ষিকী তাঁর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। অপরদিকে মৃত্যু বার্ষিকীতে প্রথমে যে ইমামের মৃত্যু হয়েছে তাঁর সম্পর্কে এবং শেষে কারাবালার ঘটনা নিয়ে আলাচনা করা হয়
জরিখানা :	ইমামবারায় সংরক্ষিত ইমাম হাসান (রা:) ও ইমাম হোসেন (রা:) এর প্রতিকী মাজার

পাক-পাঞ্জাতন : শিয়া সম্প্রদায়ের বিশ্বাস অনুযায়ী পবিত্র পাঁচ আত্মার নাম। যথাক্রমে হযরত মুহাম্মদ (সা:) হযরত আলী (রা:) হযরত ফাতেমা (রা:) ইমাম হাসান (রা:) ও ইমাম হোসেন (রা:)

আলম : কারবালার যুদ্ধে ব্যবহৃত নানা ধরনের প্রতীকী অস্ত্র। যেমন: ঢাল, তলোয়ার, বল্লম ইত্যাদি

পার্‌চক : নিশান বা বিশেষ পতাকা

সবুজ পার্‌চক : সবুজ পতাকা। কথিত আছে যে, বিষ পানে ইমাম হাসান (রা:) কে হত্যা করার ফলে ইমামের শরীর সবুজ রং ধারণ করেছিল। বিষ ক্রিয়ার প্রতীক হিসাবে সবুজ পতাকা প্রতীকী মাজারে ঝুলান থাকে

লাল পার্‌চক : লাল পতাকা। কারবালার প্রান্তরে ইমাম হোসেন (রা:) কে জবাই করে হত্যা করা হয়েছিল বলে শিয়া সম্প্রদায় বিশেষ ধরণের এই লাল পতাকা মহররম মাসে এবং ইমামবারায় ব্যবহার করে। এখানে লাল রং শহীদ ইমাম হোসেন (রা:) এর রক্তের প্রতীক

কাল পার্‌চক : কাল পতাকা। কাল শোকের রং। কারবালার হৃদয় বিদারক শোকের চিহ্ন হিসেবে মহররমের মিছিলে ও ইমামবারায় কাল পতাকা ঝুলান থাকে

মাতম :	কারবালার প্রান্তরে শহীদ ইমামদের স্মরণে বুকে আঘাত করে শোক প্রকাশ করা
তাজিয়া :	ইমাম হাসান (রা:) ও ইমাম হোসেন (রা:) কবরের প্রতীক
শাম-এ-গরিবা :	ইমামবারায় আলো নিভিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মহররম মাসের দশ তারিখ সন্ধ্যার মহররমের হৃদয় বিদারক ঘটনার বর্ণনা করা হয়
জুল-জানাহ্ :	তেজী ঘোড়া। কারবালার প্রান্তরে যুদ্ধে ব্যবহৃত ইমাম হোসেন (রা:) এর ঘোড়া
দুলদুল :	যুদ্ধে যাওয়ার সময় জুল-জানাহ এবং যুদ্ধে ইমাম হোসেন (রা:) শহীদ হওয়ার পর জুল-জানাহই দুলদুল হয়ে ক্লান্ত দেহে শোকে কাতর হয়ে ইমাম হোসেন (রা:) এর শহীদ হওয়ার খবর তাঁর পরিবারের সদস্যদের কাছে পৌঁছে দেয়

১. বিবিকা রওজা ইমামবারা (১৬০০), ঢাকা

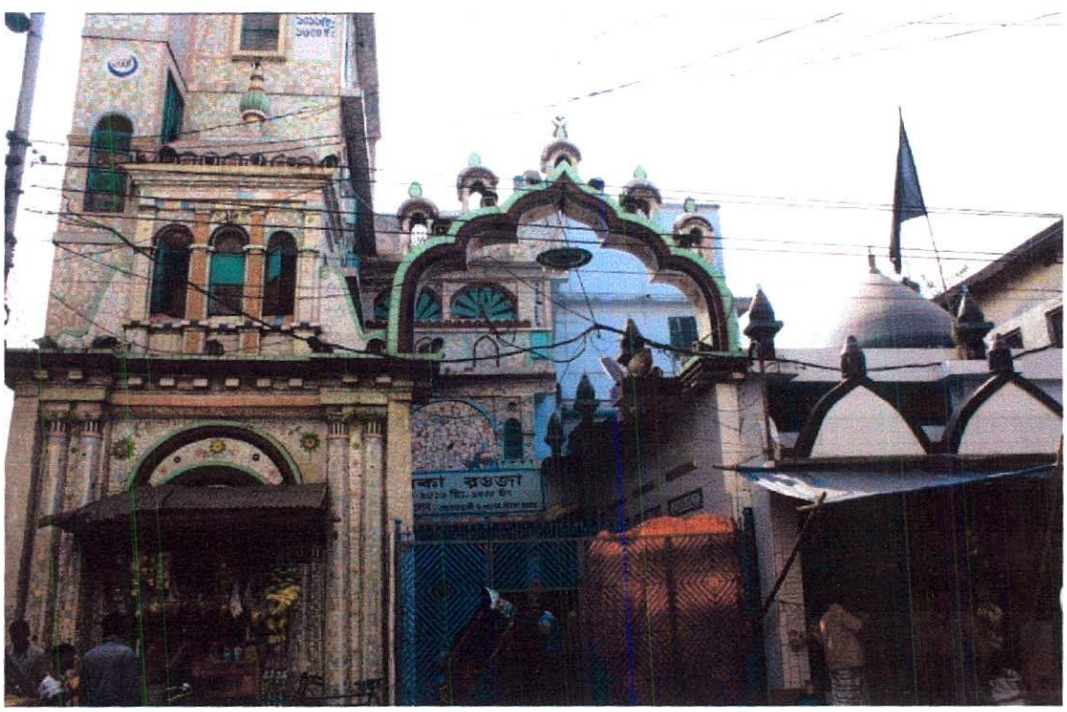

১.১ বিবিকা রওজা ইমামবারার প্রধান প্রবেশ পথ

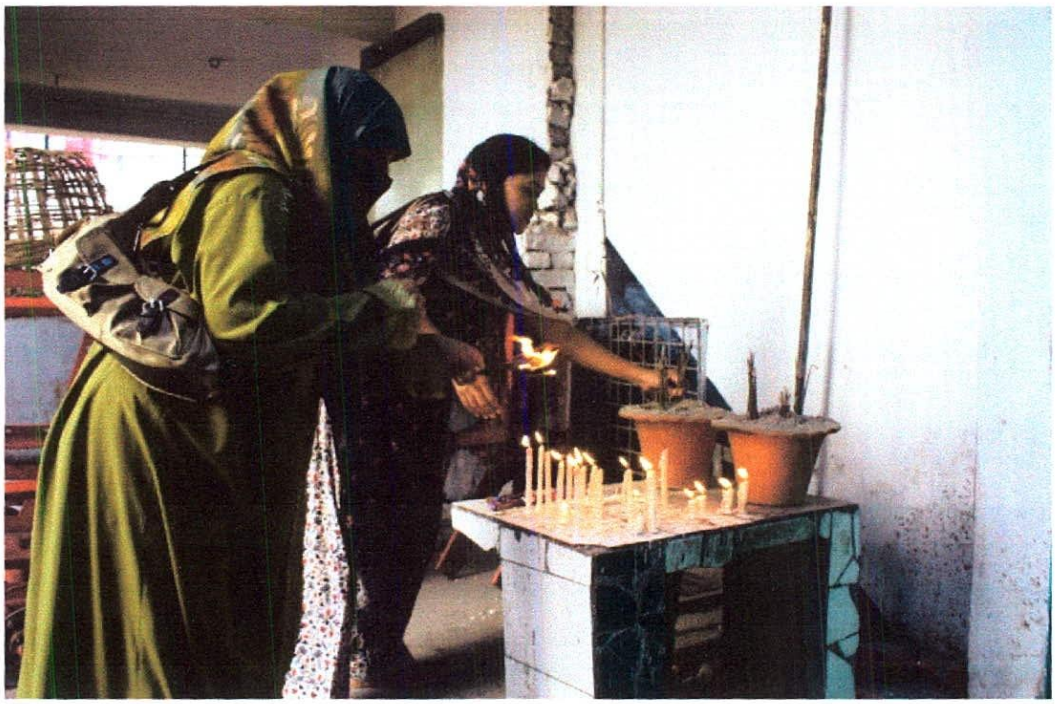

১.২ বিবিকা রওজা ইমামবারায় মোমবাতি জ্বালাচ্ছেন কয়েকজন নারী

২. হোসেনী দালান ইমামবারা, (১৬৪২) ঢাকা

২.১ হোসেনী দালান ইমামবারার সম্মুখ চিত্র

২.২ হোসেনী দালান ইমামবারার প্রধান প্রবেশ পথ

২.৩ হোসেনী দালান ইমামবারার বর্গাকৃতির স্তম্ভে আরবী ক্যালিওগ্রাফী এবং ফুলের নকশা

২.৪ পুকুরসহ হোসেনী দালান ইমামবারা

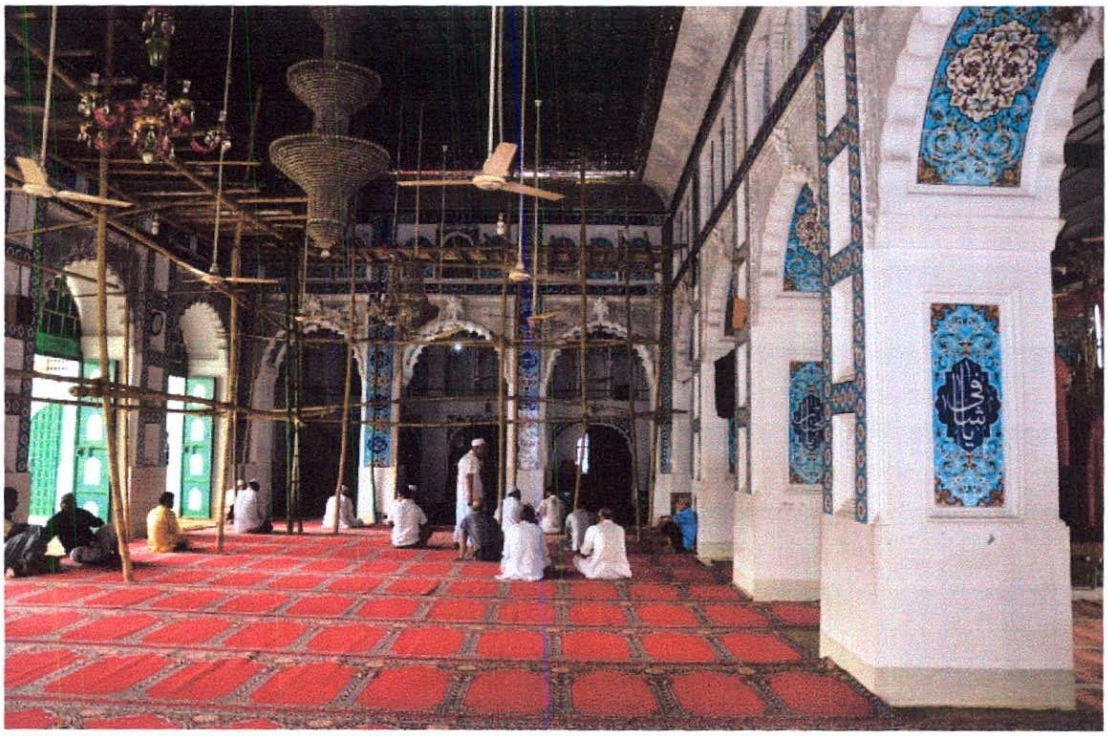

২.৫ হোসেনী দালান ইমামবারার অভ্যন্তরের চিত্র

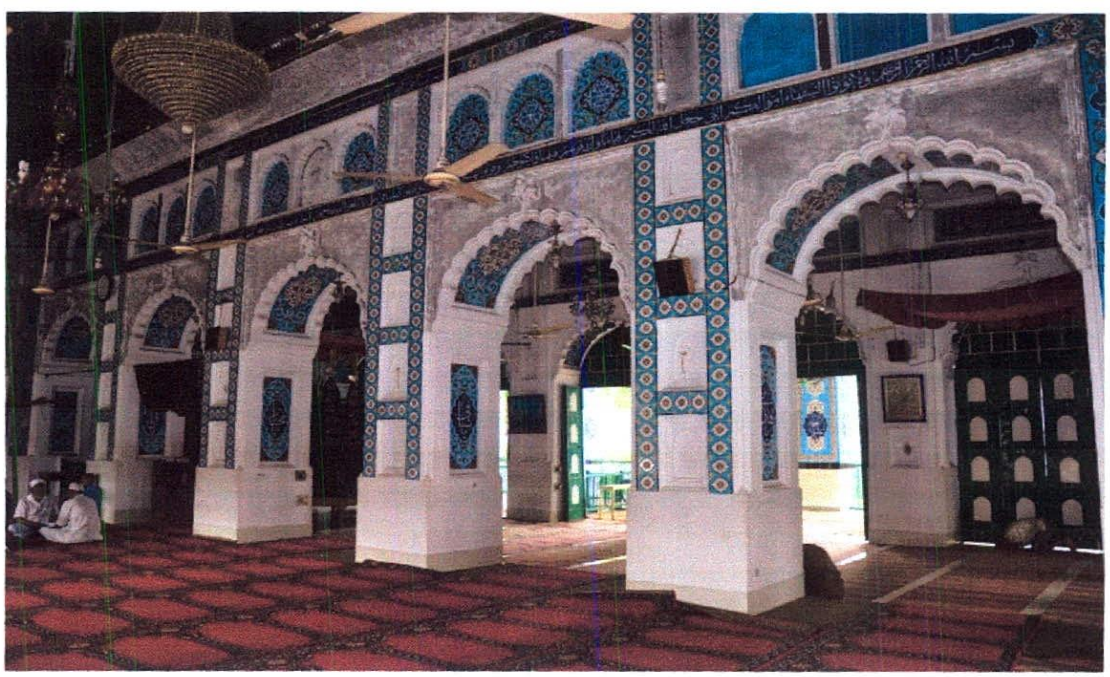

২.৬ হোসেনী দালান ইমামবারার অভ্যন্তরে বহুখাঁজ বিশিষ্ট খিলান

২.৭ ইমামবারার অভ্যন্তরে ইমাম হাসান (রাঃ) ও ইমাম হোসেন (রাঃ) এর প্রতীকী মাজার

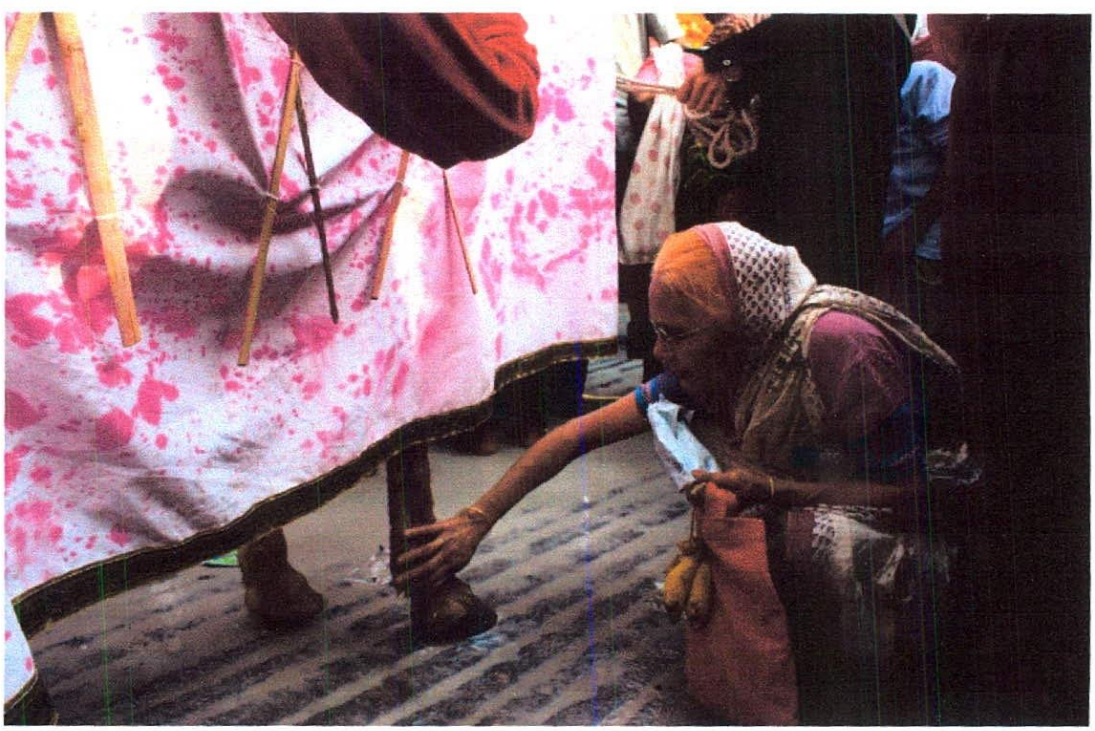

২.৮ মহররম মাসে আশুরার দিন জীবন্ত প্রতীকী দুল দুল ঘোড়ার পা দুধ দিয়ে ধোয়ে দিচ্ছেন একজন

২.৯ মহররমে আশুরার দিন দুল দুল ঘোড়ার পা ধোয়া দুধ সংগ্রহে ব্যস্ত কয়েকজন

২.১০ মহররমের দিন দুল দুল ঘোড়ার পা ধোয়া দুধ শিশুদের শরীরে মাখিয়ে দেওয়ার দৃশ্য

২.১১ মহররমের দিন দুল দুল ঘোড়ার পা ধোয়া দুধ নিজের শরীরে দিচ্ছেন একজন নারী

২.১২ ঢাকার আজিমপুরে মহররমের মিছিলে অংশগ্রহণকারী জনতা

২.১৩ ঢাকার আজিমপুরে মহররমের মিছিলে প্রতীকী মাজার বহনকারী জনতা

২.১৪ ঢাকার আজিমপুরে মহররমের মিছিলে শোকের পতাকাবাহী জনতা

১.১৫ ঢাকার আজিমপুরে মহররমের মিছিলে শোকের পতাকা সহকারে জনতা

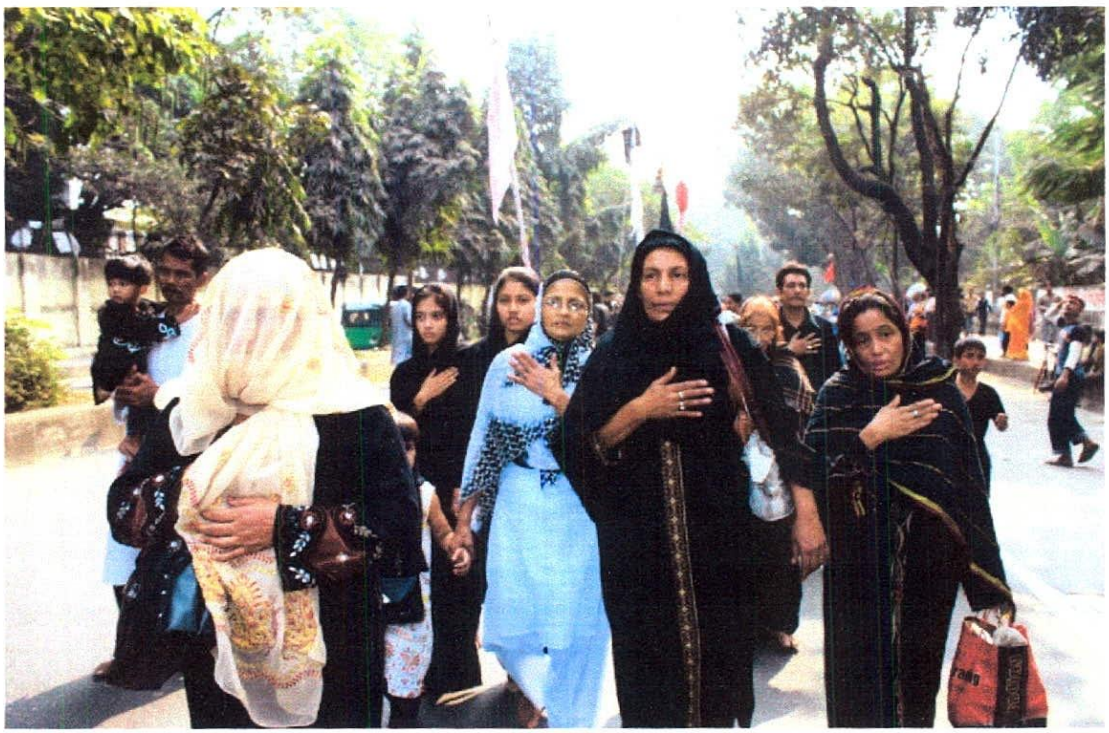

২.১৬ ঢাকার আজিমপুরে মহররমের মিছিলে মাতমরত অংশগ্রহণকারী মহিলাগণ

২.১৭ ঢাকার আজিমপুরে মহররমের মিছিলে অংশগ্রহণকারী কিছু লোক ছোরা দিয়ে নিজের শরীর ক্ষত-বিক্ষত ও রক্তাক্ত করছেন

৩. মোহাম্মদপুর ইমামবারা (শিয়া মসজিদ), ঢাকা

৩.১ মোহাম্মদপুর ইমামবারা প্রবেশ পথ

৩.২ মোহাম্মদপুর ইমামবারায় সংরক্ষিত আলম ও বিশেষ পতাকা

৩.৩ মোহাম্মদপুর ইমামবারায় মহররমের মিছিলে ব্যবহৃত আলম ও পতাকাযুক্ত মিম্বর

৪. মগবাজার ইমামবারা, ঢাকা

৪.১ মগবাজার ইমামবারা

৪.২ মগবাজার ইমামবারা অভ্যন্তরের মিম্বর

৪.৩ মগবাজার ইমামবারার অভ্যন্তরের সংরক্ষিত জারীখানা

৫. মিরপুর ইমামবারার অভ্যন্তরে সংরক্ষিত তাজিয়া

৬. পল্টন ইমামবারা, ঢাকা

৬.১ পল্টন ইমামবারা

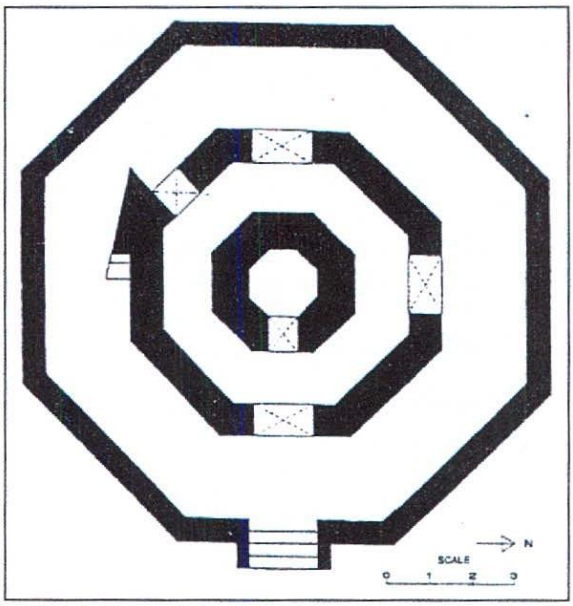

৭. ভূমি নকশা, মাধৈল ইমামবারা, নওগাঁ

৮. ঠাকুরগাঁও ইমামবারা

৮.১ গাছে আচ্ছাদিত ঠাকুরগাঁও ইমামবারা

৯. গড়পাড়া ইমামবারা, মানিকগঞ্জ

৯.১ গড়পাড়া ইমামবারার উন্মুক্ত প্রাঙ্গন

৯.২ গড়পাড়া ইমামবারার মহররমের মিছিলে ব্যবহৃত তাজিয়া

৯.৩ গড়পাড়া ইমামবারার ঢঙ্কা (ঢোল)

১০. পৃত্রিম পাশা ইমামবারা, মৌলভী বাজার

১০.১ পৃত্রিম পাশা ইমামবারার পেছনের চিত্র

১০.২ পৃত্রিম পাশা ইমামবারার সিঁড়িযুক্ত প্রবেশ পথ

১০.৩ পৃত্রিম পাশা ইমামবারায় কাঠের তৈরী তাজিয়া

১১. মুড়ালী ইমামবারা, যশোর

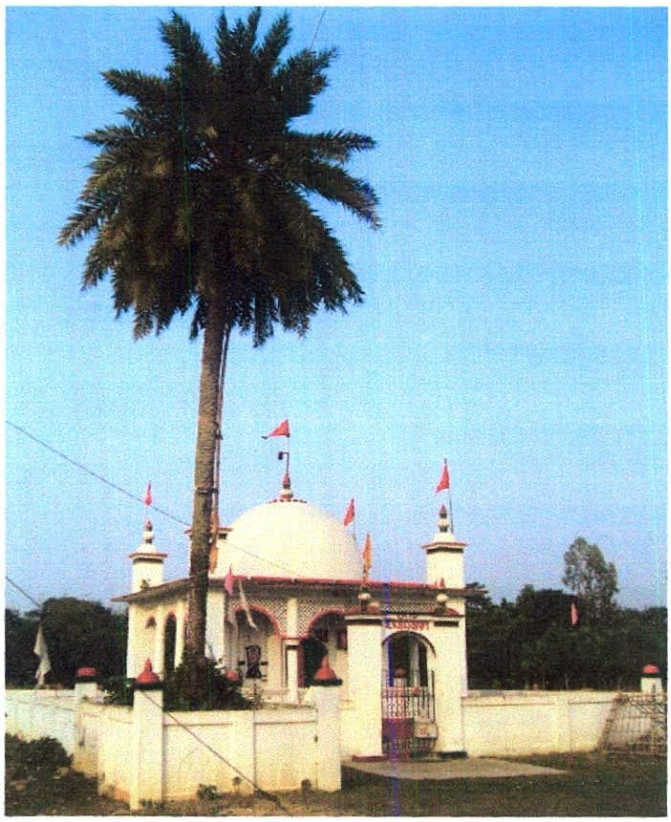

১২ সুলতানশী ইমামবারা, হবিগঞ্জ

১৩. চন্দ্রচুড়ী ইমামবারা, হবিগঞ্জ

১৩.১ চন্দ্রচুড়ী ইমামবারার পাক-পাঞ্জাতন

১৩.২ চন্দ্রচুড়ী ইমামবারার মহররমের মিছিলে ব্যবহৃত বাঁশ ও কাগজ দিয়ে তৈরী প্রতীকী দুলদুল ঘোড়া

১৩.৩ চন্দ্রচুড়ী ইমামবারার ভিতরের মাজার

১৪. সদরাবাদ ইমামবারা, হবিগঞ্জ

১৪.১ সদরাবাদ ইমামবারার অলংকরণ

১৫. কুর্শী ইমামবারার ফ্যাসাদ, হবিগঞ্জ

১৫.১ কুর্শী ইমামবারার পার্শ্ব চিত্র

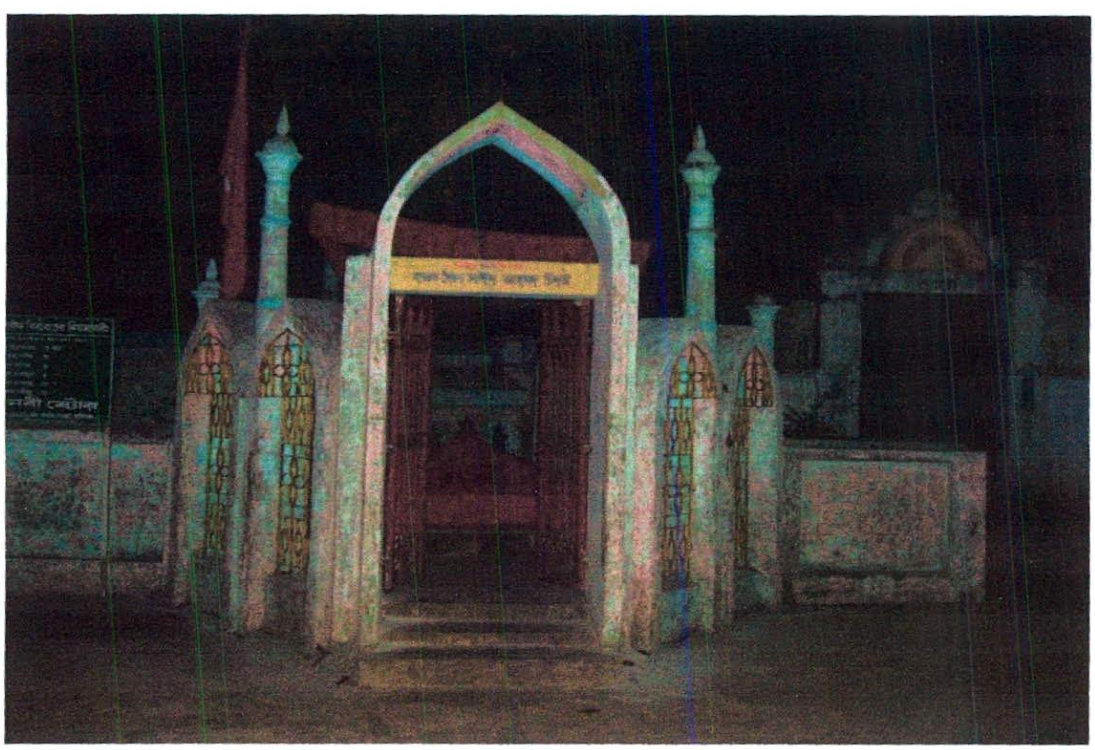

১৬. মুড়ারবন্দ ইমামবারা, হবিগঞ্জ

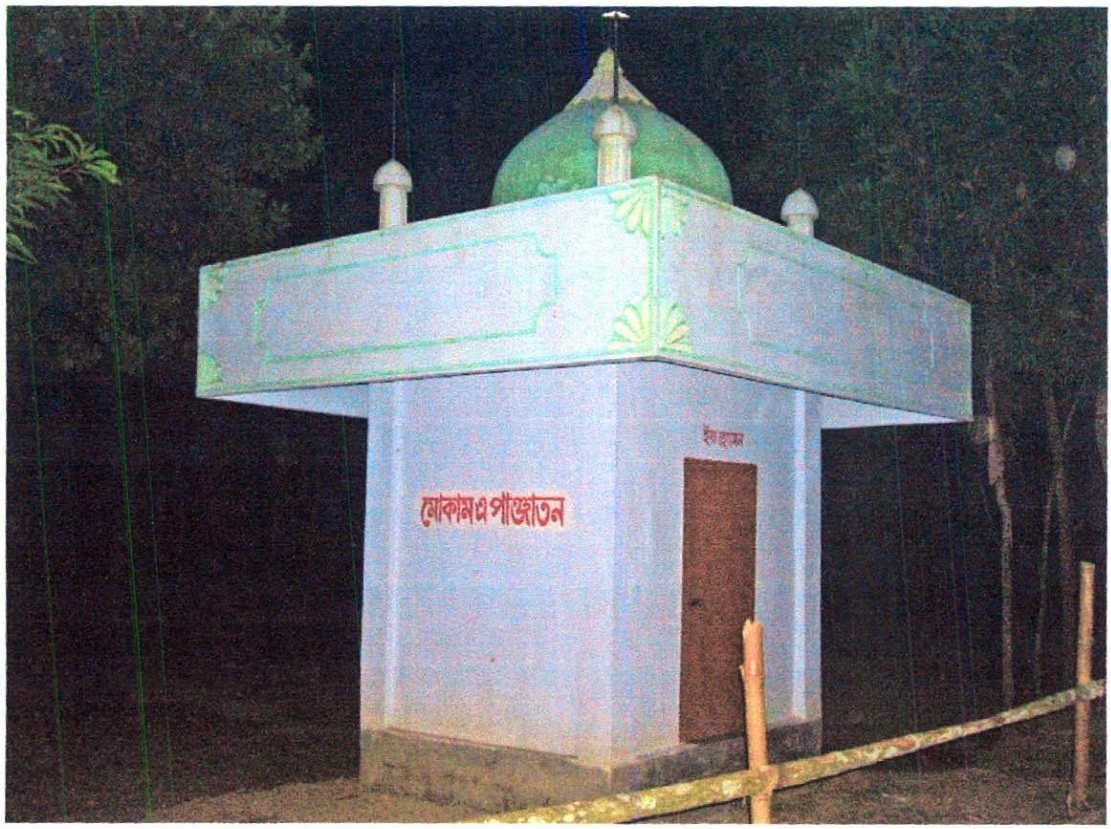

১৬.১ মুড়ারবন্দ ইমামবারার পাক-পাঞ্জাতন

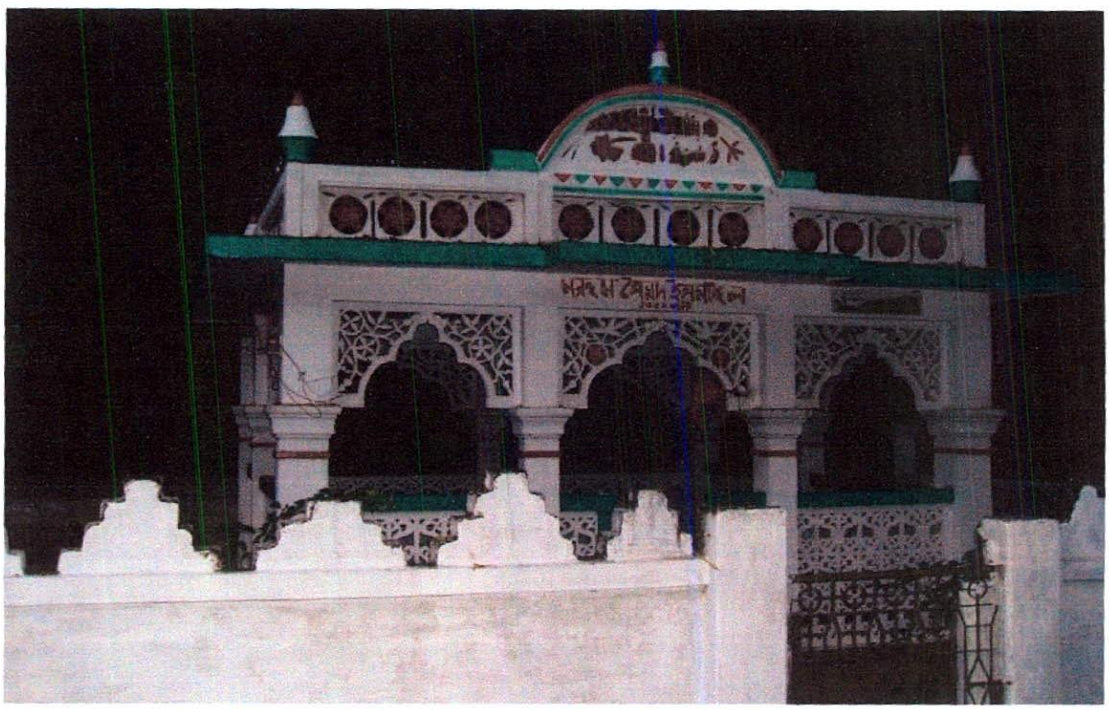

১৭. সুরাবই ইমামবারা, হবিগঞ্জ

১৭.১ সুরাবই ইমামবারার পাক-পাঞ্জাতন

১৮. চট্টগ্রাম ইমামবারা

১৮.১ চট্টগ্রাম ইমামবারার মেহরাব ও মিম্বর যুক্ত ভিতরের চিত্র

গবেষণায় ব্যবহৃত আলোকচিত্রগুলো মাঠ পর্যায়ে গিয়ে গবেষকের নিজের তোলা। শুধুমাত্র মাধৈল ইমামবারার ভূমি নকশাটি বই থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি ও তথ্যসূত্র

Ahmed, Sharif Uddin, *Dhaka Past Present and Future,* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1991

Brown, Percy, *Indian Architecture,* (Islamic period, vol-ii) Mumbai: D.B. Taraporevala Sons & Co, Private Ltd, 1956.

Dani, A. H. *A Record of Its Changing Fortunes,* Dacca: Mrs. Safya S. Dani, 1956

------,------- *Muslim Architecture in Bengal,* Dacca: Asiatic Society of Bangladesh, 1961

Forest, G. W. *Cities of India* (Past and Present), Delhi: Shubhi Publication, 1999

Grover, Satish, *The Architecture of India,* New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd, 1981

Haque, Enamul, *Islamic Art Heritage of Bangladesh,* Dhaka: Bangladesh National Museum, 1983

Hasan, S. M. *A Guide to Ancient Monoments East Pakistan,* Dacca: Society for Pakistan Studies.1970

-------,------- *Glimpses of Muslim Art and Architecture,* Dhaka: Islamic Foundation of Bangladesh, 1983

Hill, D. and O, Grabar, *Islamic Architecture and its Decoration,* London: Faber Faber Ltd, 1967

Hollister, J.N. *The Shi'a of India,* London: Luzac & Co., 1979

Kohlberg, Etan, *Belief and Law in Imami Shi'ism,* London: Variorum, Gower House, 1991

Nasr, Seyyed Hossein, *Shiite Islam,* London: George Allen & Unwin Ltd, 1975

Taifoor, Sayed Muhammed, *Glimpses of Old Dhaka,* Dhaka: Lulu Belquis Banu, 1956.

আহমেদ, সুফিয়া, *ঢাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ঢাকার নবাব পরিবারের ভূমিকা* (অন্তর্ভুক্ত) ইফতিখার-উল-আওয়াল (সম্পা) ঐতিহাসিক ঢাকা মহানগরী: বিবর্তন ও সম্ভাবনা, খণ্ড-৫, ঢাকা: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ২০০৩

আহমদ, ওয়াকিল, *উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানদের চিন্তা ও চেতনার ধারা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩

--------,-------- লোকসংস্কৃতি, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৭, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭

আহমেদ, শরীফ উদ্দিন, *ঢাকার ইতিহাস ও নগর জীবন* (১৮৪০-১৯২১), ঢাকা: হাবিবুর রহমান প্রেস এন্ড পাবলিসার্স লি, ২০০১

ইসলাম, রফিকুল, *ঢাকার কথা*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮২

ইসলাম, আমিনুল, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি,* ঢাকা-২০০৬

ইলিয়াছ, এস.এম. *ঐতিহাসিক কারবালা*, ঢাকা: মিসেস বিলকিস বেগম, ২০০৩

করিম, আব্দুল, *মোগল রাজধানী ঢাকা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪

করিম, মুহম্মদ রেজা-ই, *আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭২

খান, ইউসুফ আলী, *তারিখ-ই-বঙগলা-ই মহবত জঙী*, খণ্ড-১, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭

--------,------- *তারিখ-ই-বঙগলা-ই মহবত জঙী*, খণ্ড-২, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭

চৌধুরী, দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন, *শিলালিপি ও সনদে আমাদেও সমাজচিত্র*, ঢাকা: সৈয়দা তাহেরা বেগম, ২০০১

বিশ্বাস, সুকুমার, *বাংলাদেশের পুরাকীর্তি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪

বসু, স্বপন, *বাংলায় নবচেনার ইতিহাস*, কলকাতা: অনুপকুমার মাহিন্দার, ১৯৭৫

চৌধুরী, রব্বানী, *সিলেট-চিন্তার নৈবেদ্য*, ইউ.কে: অনীক রব্বানী চৌধুরী, ২০০৭

মজুমদার, কেদার নাথ (এম,আর,এ,এস), *ঢাকার বিবরন*, ময়মনসিং: নরেন্দ্রনাথ মজুমদার গবেষণা হাউজ, ১৯১০

মনিরজ্জামান, মোহাম্মদ, *ঢাকার লোক কাহিনী*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৬৫

মামুন, মুনতাসির, *ঢাকার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের উপাদান*, ঢাকা: পল্লব পাবলিসার্স, ১৯৯১

-------,------- *ঢাকা সমগ্র* (খন্ড - ১) ঢাকা: অনন্যা, ২০০৩- ২০০৬

-------,------- *ঢাকার স্মৃতি*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদাস, ২০০১

-------,------ *উনিস শতকের ঢাকা*, ঢাকা: অনন্যা, ২০০১

মিন্টু, আবদুল আওয়াল, *বাংলাদেশে পরিবর্তনের রেখাচিত্র*, ঢাকা: ২০০৪

রহমান, সুফি মোস্তাফিজুর ও অন্যান্য, *প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্য*, বাংলাদেশ সমিক্ষামালা-১, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭

রহিম, এম.এ. *বাংলার সামাজিক ও সংস্কৃতিক ইতিহাস*, দ্বিতীয় পত্র, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫

-----,------ *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস*, ঢাকা: নূরজাহান রহিম, ১৯৭৬

রায়, যতীন্দ্র মোহন, *ঢাকার ইতিহাস* (১ম খন্ড), কলকাতা: কামাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯১২

449961

-------,-------- *ঢাকার ইতিহাস* (২য় খন্ড), কলকাতা: কামাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ১৯১৫

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

রায়, অনিরুদ্ধ, *মধ্যযুগের ভারতীয় শহর*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিসার্স প্রাইভেট লিঃ, ১৯৯৯

হাসান, পারভিন, *স্থাপত্য ও চিত্রকলা*, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.) বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০০

হোসেন, নাজির, *কিংবদন্তির ঢাকা*, ঢাকা: আজাদ মুসলিম ক্লাব পাবলিক লাইব্রেরী, ১৯৭৬

হোসেন, এ.বি.এম. 'ইমামবাড়া' অন্তর্ভূক্ত/এবিএম হোসেন (সম্পা), স্থাপত্য, বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামলা-২, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭

হিট্টি, পি.কে. (ইব্রাহীম খাঁ-অনুদিত),	*আরব জাতির ইতিহাস*, ঢাকা: অবসর, ২০০২
হেমায়েতুদ্দীন, মাওলানা মুহাম্মদ,	*ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্তমতবাদ*, ঢাকা, ২০০৪
সিতারা, সানিয়া,	*ইমামবারা* (ঠাকুরগাঁও), সিরাজুল ইসলাম (সম্পা), বাংলাপিডিয়া খণ্ড-১, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩
শাহনেওয়াজ, এ.কে.এম.	*ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস* (মধ্যযুগ মোঘলপর্ব), ঢাকা: এফ. ওহমান, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, ২০০২
------,-------	*মুদ্রায় ও শিলঅলিপিতে মধ্যযুগের বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯
ফরিদী, আ.ফ.ম. আবদুল হক ও অন্যান্য (সম্পা),	ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড-৪, ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮৬
-------,--------	ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড-৮, ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮৬
-------,-------	ইসলামী বিশ্বকোষ, খন্ড-১০, ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮৬
--------,-------	ইসলামী বিশ্বকোষ, ২৩শ খন্ড, ঢাকা, ইফাবা, ১৯৮৬
ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা),	*বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-১, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩
------,---------	*বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-৮, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩
------,---------	*বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-৯, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩

-------,--------

বাংলাপিডিয়া, খণ্ড-১০, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩

সিরাজী, এম.এম. ফায়েজ,

হোসেনী দালান, ঢাকা: ২০০৫

আতিয়ার, পারভেজ,

খুলনা শিয়া ও মহররম অনুষ্ঠান, ঢাকা: ২০০৭

সাক্ষাৎকার :

অধ্যাপক ড. জিনাত আরা সিরাজী, উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (১০এপ্রিল ও ১৫ জুলাই, ২০১০)

সৈয়দ খালেদ বখ্‌ত নাজন, হবিগঞ্জ মহররম উদযাপন কমিটির সভাপতি, (বয়স ৬৫ বছর), ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৯

বাবলু মিয়া, বিবিকা রওজার বর্তমান খাদেম, (বয়স ৩০ বছর), ১১ জানুয়ারী, ২০১০

শামীম আহাম্মেদ, মোহাম্মদপুর ইমামবারা আশুরা পালন কমিটির সাবেক চেয়ারম্যান, (বয়স ৫৫ বছর), ০৩ জানুয়ারী, ২০১০

এনায়েত হোসেন, প্রধান ইমাম, মগবাজার ইমামবারা, (বয়স ৫৭ বছর), ১০ মে, ২০১০

নওয়াব আলী সরওয়ার খান, পৃত্রিম পাশা ইমামবারার উত্তরাধিকারী, মৌলভী বাজার (বয়স ৫০ বছর), ১৬ ডিসেম্বর, ২০০৯

মারুফ মণ্ডল, স্থানীয় ব্যক্তি, অষ্টগ্রাম, (বয়স ৪০ বছর), ১০ ডিসেম্বর, ২০০৯

হারুন মেম্বার, কুশী ইমামবারার উত্তরাধিকারী, (বয়স ৪৫ বছর), ১৭ ডিসেম্বর, ২০০৯

মোহাম্মদ ছামিম, অস্থায়ী খাদেম, মিরপুর ইমামবারা, (বয়স ৩৫ বছর) ০৩ জানুয়ারী, ২০১০